দ্বিতীয় অধ্যায়

মাধব কন্দলীর স্থান কাল জীবন প্রসঙ্গ ও রামায়ণ পরিচয়

(ক) প্রথম ভাগ - **কবিকথা**

দ্বিতীয় অধ্যায়

'কবি' এই শব্দটিই রহস্যময় । কবি যদিও সমাজেরই একজন তবু যেন এক অপরিচয়ের আড়ালে থাকেন । কবিকে ব্যক্তিগত হিসাবে জানলেও ভাবগত ভাবে যেন কখনই জানা হয়ে ওঠে না । তাই কবি সর্বকালে সর্বযুগেই এক কল্পনার সামগ্রী । কবির কল্পনার প্রকাশই কবিকে জনসাধারণ থেকে একটু দূরত্ব দিয়েছে । রবীন্দ্রনাথ বলেছেন' কবিরে পাবে না তাহার জীবন চরিতে' । উক্তিটি তাৎপর্যপূর্ণ । কবির ভাবগত জীবন ও সামাজিক জীবনে এই বিরোধ কখনো বা বৈপরীত্য - বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে । বোধহয় এই ধারণার ভিত্তিতেই এরিস্টোটল বলেছিলেন কবির রথের ঘোড়ার রঙ কালো ; কবি মিথ্যে কথা বলেন আর সেই মিথ্যেকে সত্য বলে ধরে নিতে পাঠকসমাজকে বাধ্য করেন । তাই তাঁর আদর্শ নগর থেকে কবিকে নির্বাসিত করেছিলেন ।

ভারতের বিশ্রুত ও চিরায়ত দুই মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত । রামায়ণ বা রামকথা লৌকিক সংস্কৃতে রচিত ও স্বীকৃত সর্ব প্রাচীন মহাকাব্য এবং সর্বাধিক জনপ্রিয় । প্রাচীন কাল থেকেই এই কাব্য নানা ভাষায় অনূদিত হয়েছে । অসমীয় ভাষার একদা প্রাচীন অনুবাদক কবি মাধব কন্দলী ।

কবিরাজ কন্দলী

মধ্যযুগের কবি হওয়ার দরুণ তাঁর ব্যক্তিজীবন ও পরিচয় সম্বন্ধে পাঠকের জ্ঞান খুবই সংক্ষিপ্ত ও সীমাবদ্ধ । কাব্যের ভণিতায় বিভিন্ন স্থানে কবির নাম 'কবিরাজ কন্দলী' বা মাধব কন্দলী বিপ্র বা বিপ্ররাজ পাওয়া যায় । বিপ্র বা বিপ্ররাজ উল্লেখে প্রমাণিত হয় যে তিনি বর্ণে ব্রাহ্মণ ছিলেন । 'কবিরাজ' সম্ভবত: কবির রাজা এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছিল । আবার কোন রাজার সভাকবিকে ছন্দের প্রয়োজনে 'কবিরাজ' সম্বোধনের সম্ভাবনাও থাকে । তবে মনে হয় এই সম্মান তৎকালীন বিদগ্ধ সমাজের দান । যাহোক তাঁর রামায়ণে মাধব ও এক স্থানে নিজের পরিচয় দিয়েছেন –

"কবিরাজ কন্দলী যে আমাকে সে বুলি কয় মাধব কন্দলী মোর নাম ।"

কন্দলী উপাধি বিশিষ্ট প্রাচীন আসামের বেশ কয়েকজন কবির নাম পাওয়া যায়। যেমন রুদ্র কন্দলী, অনন্ত কন্দলী, শ্রীধর কন্দলী ইত্যাদি। কন্দলী বিপ্রেরা সাধারণত: বিখ্যাত পন্ডিত হতেন আর কূটনৈতিক কাজেও পান্ডিত্যের প্রয়োজন হত। অনন্ত কন্দলীর উক্তিতে পাওয়া যায় যে তিনি তর্কে জয়ী হওয়ায় কন্দলী আখ্যা পেয়েছিলেন, সুতার্কিককেও কন্দলী আখ্যা দেওয়া যায়। সংস্কৃতে কন্দল শব্দের অর্থ যুদ্ধ বা তর্ক + অসমীয়া ই প্রত্যয় যোগে কন্দলী শব্দ নিষ্পন্ন। তাই এটা বংশানুক্রমিক উপাধি নাও হতে পারে। আবার আসামের নগাঁও অঞ্চলে 'কন্দলী গাঁও' নামে একটি গ্রাম আছে। এমনও হতে পারে যে এই গ্রামের কোনো অধিবাসী সুতার্কিক ছিলেন এবং তাঁর খ্যাতির গোচরে কন্দলীর গ্রাম থেকে কন্দলী গাঁও হয়েছে। উক্ত ব্যাখ্যা থেকে এটুকু উপলব্ধি করা যায় যে মাধব কন্দলী একজন জ্ঞানী পন্ডিত ও তার্কিক ছিলেন, এবং তাঁর রচনায় এর খানিকটা পরিচয়ও পাওয়া যায়। কথাটি বিশ্লেষণযোগ্য। তার্কিক কথাটির তাৎপর্য যুক্তিবাদী বিচারবুদ্ধিকে প্রাধান্য দেওয়া যায়। প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা যায় যে নব্য ন্যায় শাস্ত্রের অন্য নাম তর্ক বিদ্যা। নব্যন্যায় শাস্ত্রে উত্তীর্ণ পন্ডিতগণ উপাধি লাভ করেন – তর্কতীর্থ, তর্করত্ন, তর্কভূষণ ইত্যাদি। মাধব কন্দলী নিজের রচনা সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন –

১. বাল্মীকি রচিল শাস্ত্র পদ্য পদ্য ছন্দে।
তাহাক বিচার আমি করিয়া প্রবন্ধে ॥
আপোনার বুদ্ধি অর্থ যিমত বুজিলো।
সংযোগ করিয়া তাক পদ বিরচিলো ॥
সমস্ত বয়স্ক কোনে জানিবাক পারে।
পক্ষী সব উরয় যেন পথা অনুসারে ॥ (কিষ্কিন্ধ্যা কান্ড ৩১১১-১২)

পুনশ্চ - ২. সাত কান্ড রামায়ণ পদবন্ধে নিবন্ধিলো
লম্ভা পরি হরি সারোদ্ধৃত।
মহামাণিক্যের বোলে কাব্যরস কিছু দিলো
দুগ্ধক মথিলে যেন ঘৃত ॥ (লঙ্কাকান্ড - ৬৭১০)

উদ্ধৃতি দুটির মধ্যে মূল তাৎপর্য হচ্ছে এই যে কবি বিচার করে বাহুল্য বর্জন করে যথাসম্ভব সংক্ষেপে রামায়ণ রচনা করেছেন। কিন্তু লক্ষ্য রেখেছেন যেন রস হানি না হয় এবং তাই কাব্যরসও প্রয়োজনে সংযোজন করেছিলেন। রামায়ণ অনুবাদে মাধব কন্দলীর এই বিচারবুদ্ধি প্রাধান্য পেয়েছে। বোধহয় এই কারণেই পরবর্তী কবি - অসম সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধারক শ্রীশঙ্করদেব বলেছেন —

পূর্ব কবি অপ্রমাদী   মাধব কন্দলী আদি

তেহে বিরচিলা রামকথা।

হস্তীর দেখিয়া লাদ   শশা যেন পারে মার্গ

মোর ভৈল তেহ্নয় অবস্থা ॥

(উত্তর কান্ড - ৭০৪১)

অপ্রমাদী - কথাটির তাৎপর্য - বুদ্ধিযুক্ত নৈপুণ্যে পারদর্শী, যিনি ভুলত্রুটি বর্জিত।

মাধব কন্দলী সুবক্তা ও সুকথক ছিলেন। তিনি রাজসভাতে ব্যাখ্যা করে - সর্বদা রামভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করতেন। প্রচলিত রীতি অনুসারে কোন বর্ণনা শেষ করে তিনি যে সব ভণিতা দিয়েছেন তার মধ্যে রচনার মাধুর্য ও অন্তরের রামভক্তির পরিচয় সুস্পষ্ট। প্রত্যেক কান্ড থেকে একটি করে ভণিতা উল্লেখ করে দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক—

১. শুনা রামায়ণ সভাসদ নিরন্তর।
শ্রবণেতে তরি সুখে সংসার সাগর ॥
পরম মঙ্গল রূপ মাধবের নাম।
তাঙক মনে ধরি ডাকি বোলা রাম রাম ॥ (অযোধ্যা কান্ড ১৬৫৭)

২. পুণ্যক সঞ্চিংয়ো   সমক বঞ্চিংয়ো
সংসার করি মোচনে।
এরি আন কাম   বোলা রাম রাম
ঘুমিয়োক মনে মনে ॥ (অরণ্য কান্ড ৩০৫৫)

৩. শুনা সভাসদচয় সাক্ষাতে অমৃতময়
রামর চরিত্র অনুপাম ।
মাধব কন্দলি ভনে বুলিলেক জনে জনে
ডাকি উচ্চ করি রাম নাম ॥
(কিষ্কিন্ধ্যা কান্ড ৩৭২৩)

৪. শুনিয়োক সভাসদ মধুর কোমলপদ
পুণ্যকথা রামর চরিত্র ।
যমপথ নিবারণ কলিমল সংহারণ
মহারস শ্রবণে-অমৃত ॥ (সুন্দরা কান্ড ৪৮৪৮)

৫. শুনা নিরন্তরে ইটো রামায়ণ কথা ।
ইহেন মানবী জন্ম ন করিয়ো বৃথা ॥
রামর চরিত্র ইটো শুনা সভাসদ
বোলা রাম রাম পাইবা পরম সম্পদ ॥ (লঙ্কা কান্ড ৬৬৮৬)

মাধব কন্দলীর রামায়ণ পাঁচ কান্ড কেন ?

এখানে আর একটি জটিল প্রশ্ন সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক । লঙ্কা কান্ডের সমাপ্তির কালে কবি মাধব কন্দলী লিখেছেন —

সাত কান্ড রামায়ণ পদবন্ধে নিবন্ধিলো
লম্ভা পরিহরি সরোদ্ধৃত । (৬৭১০)

অথচ মাধব কন্দলীর রচিত পাঁচ কান্ড – অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দরা ও লঙ্কা কান্ড মাত্র পাওয়া যায় । এই খন্ডিত রামায়ণকে পূর্ণতা দান করার জন্যই শ্রীশঙ্করদেব ও শ্রীমাধব দেব – যথাক্রমে উত্তরা কান্ড ও আদি কান্ড রচনা করে – সপ্তকান্ড রামায়ণ রচনা করেছিলেন । মাধব কন্দলীর কাল থেকে শ্রীশঙ্করদেবের ব্যবধান খুব বেশি হলেও শতাধিক বৎসরের অধিক মনে হয় না । এই স্বল্প কালের

মধ্যে কি রচিত দুই কান্ড লুপ্ত হয়ে যেতে পারে ? সাধারণ বুদ্ধিতে এবং জনপ্রিয় রচনার ধারার সাক্ষে, তাই মনে হয় হয়ত মাধব কন্দলী আদি ও উত্তর কান্ড রচনা করেন নি, পাঁচটি কান্ডই রচনা করেছিলেন। উত্তরা কান্ড যে অপর কবি বা অন্য বাল্মীকি দ্বারা রচিত - মূল রামায়ণের অঙ্গ নয়, এই মত বহুল প্রচারিত। আদিকান্ডও রামায়ণের মূল কাহিনী — রামের বনবাস, সুগ্রীব মিলন - সীতাহরণ - রাবণ বধ — রচনার পরে পূর্ব সূত্র রক্ষার জন্য পরে সংযোজিত হয়েছিল বলে মনে করেন অনেক পন্ডিত। এই প্রসঙ্গে সপ্তকান্ড রামায়ণ গ্রন্থের সম্পাদক হরিনারায়ণ দত্ত বড়ুয়া সাহিত্যরত্নের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য — "প্রাচ্য আরু পাশ্চাত্য পন্ডিত কিছুমানর মতে রামায়ণ আদিতে পাঁচ কান্ড হে আছিল। আদিকান্ড আরু উত্তরাকান্ড পাচতহে রচিত হৈছিল। সংস্কৃত পন্ডিত কারো কারো মতে আদি আরু উত্তর কান্ডর কবিত্ব হেনো আন পাঁচ কান্ড তকৈ তলস্থাপর। তদুপরি এই দুই কান্ডত রামক পূর্ণ ব্রহ্ম করিছে কিন্তু মাজর পাঁচ কান্ডত বাল্মীকিয়ে রামক আদর্শ মানব হিচাবে বর্ণনা করিছে। সম্ভবত: এই কারণে বিভিন্ন ভাষায় কিছুমান রামায়ণ পাঁচ কান্ডর।"[২]

তাহলে গ্রন্থশেষে মাধব কন্দলী উল্লিখিত —

"সাত কান্ড রামায়ণ পদবন্ধে নিবন্ধিলো
লম্ভা পরি হরি সারোদ্ধৃত।"

এই উক্তির তাৎপর্য কি ? উক্তিটি প্রক্ষিপ্ত বলে কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেন নি। সুতরাং মাধব কন্দলী সপ্তকান্ড রামায়ণের মূল ও সার কথা সংগ্রহ করে এবং লম্ভা বা অসার অংশ পরিত্যাগ করে — পাঁচ খন্ডের মধ্যেই সম্পূর্ণ করেছেন, অনাবশ্যক বোধে আদি ও উত্তর কান্ড রচনা করেন নি — এই তাৎপর্যটি গ্রহণযোগ্য হয় না কি ? এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে অসমের রামায়ণ প্রণেতাদের মধ্যে — এই দুই খন্ড পাওয়া যায় না কেন ? আসামের বিদগ্ধ অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ লেখারু মহাশয়ও মনে করেন যে রামায়ণ সপ্তকান্ডে বিভক্ত বলেই সারসংক্ষেপ করার সময় সপ্তকান্ডের উল্লেখ করেছেন। বিশ্বখ্যাত রামায়ণ গবেষক কামিল বুলকে - তাঁর গবেষণা গ্রন্থ রামকথায় উল্লেখ করেছেন যে মহাভারতের দ্রোণপর্ব, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ আদি প্রাচীন বর্ণনায় রামের বনবাস থেকে রাবণবধ পর্যন্তই উল্লেখ আছে। সুতরাং মাধব কন্দলী যে সপ্তকান্ডের মূল বিষয়

নিয়েই সংক্ষেপে সংহতভাবে রামায়ণের মূল কাহিনী পাঁচটি কান্ডেই সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছিলেন, তদধিক দুই কান্ডের রচনার কথা অনাবশ্যকবোধে ভাবেন নি — এই সিদ্ধান্ত কি যুক্তিহীন স্বকপোলকল্পিত মনে হবে ?

মাধব কন্দলীর রামায়ণে লৌকিক কথা

রামায়ণের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদকগণের মধ্যে বাল্মীকির মূল কাঠামোর প্রতি আনুগত্যে ও সংহত যুক্তিসিদ্ধ কাহিনী কথনে — মাধব কন্দলীর স্থান সর্বাগ্রে ও সমুচ্চ । এই জন্যই মূলত: শ্রীশঙ্করদেব তাঁকে অপ্রমাদী কবি বলে আখ্যাত করেছিলেন। কবি নিজেও বলেছেন —

"সাতকান্ড রামায়ণ পদবন্ধে নিবন্ধিলো
লম্ভা পরি হরি সারোদ্ধৃত ।"

অসার অংশ বাদ দিয়ে সারকথা বলেছেন তিনি । কিন্তু কবি তো কেবল ঘটনার বিবরণ করেন না ঐতিহাসিকের মত, তিনি কাব্য রচনা করেন । কাব্য হচ্ছে রসাত্মক বাক্য — কাব্যং রসাত্মকং বাক্যম্ । রস সৃষ্টির জন্য, কবিকে অবশ্যই নানা সরস কথা, বিষয়, ঘটনা সংযোজন করে কথাকে পাঠক ও শ্রোতৃবর্গের হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে হয় । কবি সে সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, আগ্রহী ছিলেন তাঁর পৃষ্ঠপোষক বরাহরাজ শ্রীমহামানিক্য দেবও । তাই নিজের কবিহৃদয়ের প্রেরণায় ও পৃষ্ঠপোষক রাজার অনুরোধে কিছু কাব্যরসও দিয়েছেন । কবি বলেছেন —

"কবিরাজ কন্দলি যে আমাকে সে বুলি বয়
করিলোহো সর্বজন বোধে ।
রামায়ণ সুপয়ায় শ্রীমহামাণিকে যে
বরাহ রাজার অনুরোধে ॥
সাতকান্ড রামায়ণ পদবন্ধে নিবন্ধিলো
লম্ভা পরি হরি সারোদ্ধৃত ।
মহামাণিকর বোলে কাব্যরস কিছু দিলো
দুগ্ধক মথিলে যেন ঘৃত ।" (লঙ্কাকান্ড - ৬৭১০)

112945
7 MAY
NORTH BENGAL
University Library
Raja Rammohunpur

কিষ্কিন্ধ্যা কান্ড রচনা শেষ করে কবি সবিনয়ে বলেছেন যে রামায়ণ রচনায় রস সৃষ্টির জন্য যে কিঞ্চিৎ 'লম্ভা' ও বাল্মীকি রচনা বহির্ভূত 'লৌকিক' কথা ও ভাব আছে – তা নিবেদন করেছেন। পাছে রামচরিত্রের প্রতি একান্ত ভক্তিগত ও মহর্ষি রচনার প্রতি সর্বথা শ্রদ্ধাশীল কবি মাধব কন্দলীর এই জাতীয় রচনাংশে কেউ দোষ ধরেন – তার জন্য দেববাণী ও লৌকিক কথার পার্থক্য সম্বন্ধে নিবেদন করেছেন – পক্ষী যেমন তার ডানার শক্তি অনুসারে উড়তে পারে আকাশে, তেমনি কবিরও বুদ্ধি ও রস রচনার শক্তির সীমাবদ্ধতা আছে – এই কথা স্মরণ করিয়েছেন ও মার্জনা ভিক্ষা করেছেন।

"বাল্মীকি রচিলা শাস্ত্র গদ্য পদ্য ছন্দে।
তাহাক বিচার আমি করিয়া প্রবন্ধে ॥
আপোনার বুদ্ধি অর্থ যিমত বুঝিলো।
সঙ্ক্ষেপ করিয়া তাক পদ বিরচিলো ॥
সমস্ত রসক কোনে জানিবাক পারে।
পক্ষী সব উরয় যেন পথা অনুসারে ॥
কবি সব নিবন্ধয় লোক ব্যবহারে।
কতো নিজ কতো লম্ভা কথা অনুসারে ॥
দেববাণী নুহি ইটো লৌকিক হে কথা।
এতেকে ইহার দোষ ন লৈবা সর্বথা ॥

(কিষ্কিন্ধ্যা কান্ড - ৩১১১-১৪)

মাধব কন্দলীর এই উক্তির সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ হয় মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশ রচনার প্রারম্ভে সেই বিখ্যাত বিদগ্ধ বিনীত বচনটি –

"মন্দ: কবি যশোপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম।
প্রাংশু লভ্য ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামন:।"[৫]

আদি ও উত্তর কান্ড সংযোজন পর্যালোচনা

মোটামুটি ষষ্ঠ শতক থেকেই বৈষ্ণব তথা ভাগবত ধর্ম আলোচনার সূত্রে সন্ত ও সাধক সাধিকাদের মাধ্যমে দক্ষিণ ভারত তামিলে একটি বড় ভক্তি আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল। পঞ্চরাত্র, নারায়ণীয়, সাত্ত্বত, একান্তিক প্রমুখ নানা নামে ছিল এর পরিচিতি। ভাগবদগীতা, ভাগবতপুরাণ, নারদসূত্র, শান্ডিল্যসূত্রাদি ছিল ইহার উৎস। বহির্মন্ডলে ছিল রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্য যুগল। তারপর শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিশেষত: রামানুজাচার্যের নেতৃত্বে তা সর্বভারতে ব্যাপ্তি লাভ করে। কর্ণাটকে পুরন্দর দাস, কনক দাস প্রভৃতি সন্ত, মহারাষ্ট্রে জ্ঞানদেব, নামদেব, একনাথ, তুকারাম, রামদাস প্রমুক্ত সন্তমন্ডলীরনাম ভাগবতধর্ম বিকাশে উল্লেখযোগ্য। উত্তর ভারতে রামানুজপন্থী সাধক রামানন্দ – রামনামকে প্রাধান্য দিয়ে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এক বিরাট আন্দোলন সৃষ্টি করেন। তাঁর প্রধান বারজন শিষ্যের মধ্যে নানা জাত শ্রেণী বর্ণের সমন্বয় ঘটেছিল। যেমন রবিদাস ছিলেন চর্মকার, কবীর জোলা, ধন্না জাট কৃষক, সেনা ক্ষৌরকার, পীপা রাজপুত ইত্যাদি। এই ধারায়ই এসেছিলেন উত্তর ভারতের মধ্যযুগের সন্ত সাধকমন্ডলী, তুলসীদাস, সুরদাস, দাদু, রজ্জব প্রমুখ। এই ভক্তি আন্দোলনে প্রথম তরঙ্গ আসে রামকথার। রামায়ণ মহাকাব্যের সুললিত পুণ্যকথা তীর্থযাত্রীরা প্রথম আস্বাদন করেন। তারপর পূর্ব প্রান্তে উৎকল-বঙ্গ-অসমে তা বিস্তৃত হয়, কাব্য রচনা, পাঠ, গীত, নাটক, পালাগানে প্রাদেশিক ভাষায় রামকথা আলোচিত হতে থাকে। মাধব কন্দলীর রামায়ণ – এই তরঙ্গাবেগের প্রথম স্বাদু ফল। অবশ্য এই সময় জনজাতীয় রাজারা হিন্দুধর্ম গ্রহণ ও রামকথার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় পৃষ্ঠপোষকরূপে রাজশক্তিকে লাভ করেও মাধব কন্দলীর কাব্যশক্তি প্রকাশের সুযোগ পেয়েছিলেন। ভাগবত ধর্মের দ্বিতীয় তরঙ্গ কৃষ্ণাশ্রয়ী - মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ও মহাপুরুষ শঙ্করদেব – পূর্ব ভারতে বঙ্গে ও আসামে যার মুখ্য, ধারক বাহক ও চিরন্তন উৎস হয়ে আছেন।

মনে হয় এই ভাগবত ধর্মের প্রথম ধাপ - রামায়ণাশ্রয়ী দিব্যকথা, মাধব কন্দলী কৃত রামকথাকে স্থায়ী করার জন্যই শ্রীশঙ্করদেব ও তাঁর শিষ্য মাধবদেব – বাল্মীকির প্রচলিত রামায়ণের মতো সপ্তকান্ডে পূর্ণতা দিবার জন্য লেখনী ধারণ করেছিলেন।

কথা গুরুচরিতে উক্ত হয়েছে যে মাধব কন্দলীর রামায়ণ লুপ্ত হবার আশঙ্কাতেই শ্রীশঙ্করদেব লেখনী ধারণ করেন। এই আশঙ্কার একটি কারণ এই হতে পারে যে আহোম শক্তির কাছে কাছারি রাজশক্তির পরাভবে যে নৈরাজ্য দেখার সম্ভাবনা তাতে পুথিপত্র নষ্ট হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। উত্তরকবি ষোড়শ শতকের অনন্ত কন্দলীও রামায়ণ রচনা করেছিলেন এবং তার সঙ্গে ভাবাদর্শের দিক থেকে মাধব কন্দলীর রচনার পার্থক্য আছে। ড: সত্যেন্দ্রনাথ শর্মার রামায়ণের ইতিবৃত্ত গ্রন্থে বলেছেন যে অনন্ত কন্দলী রামায়ণে রামের অবতারত্ব আরোপ করেছেন যেটি বাল্মীকি তথা মাধব কন্দলীর অভিপ্রেত ছিল না। যাহোক শ্রীশঙ্করদেব ও মাধবদেব – কিন্তু মহাপুরুষীয়া ধারার ভাব আরোপ করে – উত্তরকান্ডে ও আদিকান্ডে এবং গ্রন্থ সম্পাদনায় – মাধব কন্দলী তথা বাল্মীকির ধারার কোন অংশ ক্ষুণ্ণ করেন নি।

কবির কাল বিচার

মাধব কন্দলীর রামায়ণে তাঁর জীবনী সম্বন্ধে খুব কিছু জানা যায় না। প্রাসঙ্গিক, প্রত্নতাত্ত্বিকাদি বিচারে কন্দলীর জন্মস্থান মধ্য আসাম বা নগাঁও অঞ্চল বলে ধরা হয়েছে। কিন্তু কোন্ সময়ে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল? লঙ্কাকান্ড সমাপ্তি মুখে কবি বলেছেন —

কবিরাজ কন্দলী যে আমাকে সে বুলি কয়
করিলোহো সর্বজন বোধে।
রামায়ণ সুপয়ার শ্রীমহামাণিকে যে
বরাহ রাজার অনুরোধে। (৬৭১০)

কে এই বরাহ রাজা মহামাণিক্য? তিনি কোন্ সময়ে কোথায় রাজত্ব করতেন – এটি বিচার্য।

এই মহামাণিক্যের কাল সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্তে না এলে মাধব কন্দলীর কাল সম্বন্ধে নি:সংশয় হওয়া সম্ভব নয়। নানা বিদগ্ধ পন্ডিতের মতে মহামাণিক্য ছিলেন জয়ন্তাপুরের তিনজন কছারি রাজার একজন। এই রাজারা নিজেদের বরাহীরাজ বা জয়ন্তাপুরেশ্বর নামে মধ্য আসামের নগাঁও পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখন্ডের শাসন করতেন। তাঁদের সময় ছিল ১২শ

থেকে ১৪শ শতাব্দী। শ্রীমাধবচন্দ্র বরদলৈ যিনি প্রথম রামায়ণের মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশ করেন এই বক্তব্য তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখিত আছে। তিনি আরও বলেছেন যে 'বরাহ' নাম 'বড়ো'দের সঙ্গে যুক্ত যে ভোট বর্মনরা আসামে বসবাস করার সঙ্গে সঙ্গে শাসনও করতেন — আর কন্দলী নগাঁও অঞ্চলের লোক ছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিক গেটের মতে বিজয়মাণিক্য ও ধনমাণিক্যের কাল ১৪৪১-১৫৬৮ খৃ:। এতে দেখা যায় যে মাধবচন্দ্র বরদলৈয়ের মত গ্রহণযোগ্য হলে মাধব কন্দলী শঙ্করদেবের সমসাময়িক হয়ে পড়েন। কিন্তু মাধব কন্দলীর রামায়ণখানি বিলুপ্তি থেকে রক্ষা করার জন্য শঙ্করদেব এবং মাধবদেব এর সম্পাদনা করেছিলেন, সেকথা সর্বজনগ্রাহ্য। আর শঙ্করদেব মাধব কন্দলীকে 'পূর্বকবি অপ্রমাদী' বলে যে শ্রদ্ধা অর্পণ করেছেন তাতে দুজনার সময়ের ব্যবধান সম্পর্কে কোন দ্বিধা থাকে না।

পন্ডিত হেমচন্দ্র গোস্বামীর মতে মহামাণিক্য ছিলেন কছারি বরাহী রাজা; যিনি ডিমাপুর অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। তাঁর সম্বন্ধে বলা হয় তিনি চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে রাজত্ব করতেন। একখানা প্রাচীন আহোম ইতিহাস মতে মহামাণিক্যের সপ্তম পুরুষ চেইসিং আহোম দিহিঙ্গীয়া রাজার সমসাময়িক। এখানে উল্লেখযোগ্য যে আহোমরা ইতিহাস রক্ষায় প্রাচীনতম জাতিদের একটি।

পন্ডিত গোস্বামীদেবের মতে বরাহী রাজারা ছিলেন কছারিদের একটি শাখা যারা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এঁরা আহোমদের রাজত্বের পূর্বে সদিয়ার কাছাকাছি কোনোস্থানে সোনাপুর নামে রাজধানী স্থাপন করে ব্রহ্মপুত্রের সমস্ত দক্ষিণপার শাসন করতেন। তাঁদের সম্ভাব্য সময় ১০৪৭ খ্রীষ্টাব্দ। এই সদিয়া বর্তমান অরুনাচল প্রদেশের সীমায় অবস্থিত। মহাভারতোক্ত রুক্মী ও রুক্মিনীর দেশ বলেও পরিচিত।

শ্রীগোস্বামীর উল্লেখিত 'আহোম বুরঞ্জী' (আহোম ইতিহাস) 'কছারী বুরঞ্জী' নামে ড: সূর্য কুমার ভূঞার দ্বারা প্রকাশিত। এখানে রাজার নাম মহা-মণিফা রূপে বর্ণিত। সম্ভবত: ছয়শত বৎসরের পূর্বে কোন লিপিকারের প্রমাদে মহামাণিক্যে পরিণত হয়েছেন। মাধব কন্দলী কোন স্থানে রাজার নাম 'মহা-মণি' শব্দটিও ব্যবহার করেছেন। (অরণ্য কান্ড - শ্লোক সংখ্যা ৩০২১) ফা-শব্দটি অসম জয়ন্তা এবং ত্রিপুরার রাজাদের নামের সঙ্গে ব্যবহৃত দেখা যায়। আহোম রাজারা তো সবাই 'ফা' ছিলেন — যতদিন না হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছেন।

শ্রীগোস্বামী উল্লেখিত ডেইসিং বা ডেরচোংফার সমসাময়িক দিহিঙ্গিয়া (দিহিঙ-ব্রহ্মপুত্র, ব্রহ্মপুত্র পারের রাজা) রাজার কাল হচ্ছে ১৪৯৫-১৫৩১ খ্রী: । তাই মহামাণিক্যের সময় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ বলে বিচার করা যায় ।

কছারি বুরুঞ্জীতে উল্লেখ করা কিছু স্থানের নাম নামচাং, বরহাট, সোনাপুর, বাণপুর ইত্যাদি নাম থেকে এই রাজাদের রাজধানী বর্তমান শিবসাগর জেলার কোন স্থানে ছিল বলে পন্ডিত বেণুধর শর্ম্মার বিশ্বাস । কেননা এই অঞ্চলে বাণফেরা, সোনারি, বরাহী ইত্যাদি চা-বাগানের অবস্থিতি তারই কাছাকাছি বলে ধরা যায় ।

শ্রীকালিরাম মেধীর মতে মহামাণিক্য চতুর্দ্দশ শতকের মধ্যভাগে ত্রিপুরার রাজা ছিলেন । মহামাণিক্য নামে একজন রাজা ১৩১৬-১৪০৬ পর্যন্ত ত্রিপুরায় রাজত্ব করেছেন । তাঁর কোন পূর্বপুরুষ কপিলী নদীর উপত্যকায় সম্ভবত: রাজত্ব করতেন । তৎপরবর্তী রাজা ধর্মমাণিক্যের দিনে শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর নামে দুই ব্যক্তি 'ত্রিপুরা রাজমালা' রচনা করেন । ত্রিপুরার রাজাদের মাণিক্য উপাধি উল্লেখযোগ্য ।

অসমীয়া ভাষাতত্ত্ববিদ ড: বাণীকান্ত কাকতি মহামাণিক্য জয়ন্তাপুরের কছারি রাজা আর মাধব কন্দলীকে আধুনিক নগাঁওর কোন স্থানের লোক বলে উল্লেখ করলেও কন্দলীর কাব্যের ভাষা বিচার করে তাকে চতুর্দ্দশ শতকের কবি বলেই বর্ণনা করেছেন । এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে কামরূপের পাল বংশের রাজা ইন্দ্রপাল আর ধর্ম্মপালও তাঁদের তাম্রশাসনে নিজেদের বারাহ বা শ্রীবারাহ উপাধি লিপিবদ্ধ করেছেন । আবার 'কথা-গুরুচরিত' গ্রন্থে শ্রীশঙ্করদেবের গুরু মহেন্দ্র কন্দলীর টোল পরিদর্শক বাঘ আচার্য্যের গুরুর নামও মাধব কন্দলী । কিন্তু চরিত গ্রন্থে এ কথা উল্লেখ নেই যে শঙ্করদেবের বাল্যকালে মাধব কন্দলী জীবিত ছিলেন ।

ড: সুকুমার সেন তাঁর বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে মাধব কন্দলীর পরিচয় পর্বে বরাহী রাজাদের নারায়ণের বরাহ অবতারের পৌত্র ভগদত্তের বংশধর বলে গৌরবান্বিত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন ।

ড: সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা তাঁর 'রামায়ণর ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে সংক্ষেপে এই কথা বলেছেন যে 'বরাহ বা বারাহ' রাজ সম্ভবত: বৃহৎ মঙ্গোলীয় প্রজাতির কছারি শাখার একটা অংশ আর তাঁরা বরাহী নামে পরিচিত ছিলেন। এই বংশের রাজারা নারায়ণের বরাহ অবতারের বংশধর বা বরাহী বলে পরিচয় দিতেন। তাঁরা হিন্দু সংস্কৃতি গ্রহণ করে কপিলী উপত্যকার ডবকা, যোগীজান অঞ্চলে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে এক উন্নত হিন্দু সভ্যতা গঠনে সহায়তা করেছিলেন আর রাজারা 'মাণিক্য' উপাধি গ্রহণ করেছি-লেন। এই বংশের একটি শাখা প্রথমে বরাক উপত্যকায় আর তারপর ত্রিপুরা অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। ত্রিপুরা রাজ্য ভারত সরকারের অধীন হওয়ার আগে পর্যন্ত ত্রিপুরার রাজারা 'মাণিক্য' উপাধিতে পরিচিত ছিলেন।

মহামাণিক্য বা মহামণিফার কাল সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট সময় পাওয়া না গেলেও বিভিন্ন পণ্ডিতের মতানুসারে ধরে নেওয়া যায় যে মাধব কন্দলী চতুর্দশ শতকেরই কবি ছিলেন। চতুর্দশ শতকের পরবর্তী সময়ে অপ্রচলিত কিছু ধ্বনি ও রূপ মাধব কন্দলীর গ্রন্থে রক্ষিত। লিপিকারের প্রমাদে এ গ্রন্থের প্রাচীনত্ব নষ্ট না হওয়ায় যুগ সম্বন্ধে একটা ধারণা করা সম্ভব হয়েছে। এবং এইসব বিচারের ভিত্তিতে মাধব কন্দলীর সময় সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে আসা গেছে। আর এই সিদ্ধান্তে আসার সঙ্গে সঙ্গেই এই কথা স্পষ্ট হয়ে পড়ে যে উত্তর ভারতীয় আর্যভাষাগুলির মধ্যে বাল্মীকির রামায়ণ প্রথম অসমীয়া ভাষাতেই অনূদিত হয়। পণ্ডিতপ্রবর কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ উল্লেখ করেছেন যে এই প্রাচীন আঞ্চলিক গ্রন্থখানা আদি রামায়ণের পাঠ নিরূপণে ও ইতিহাস নির্ধারণে একটি বিশিষ্ট স্থানের দাবী রাখে।

প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে রামায়ণ ছাড়া মাধব কন্দলীর 'দেবজিৎ' নামে আর একখানি বৈষ্ণবধর্ম বিষয়ক ছিল বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন।

(খ) কাব্যকথা — রামায়ণ পরিচয়

অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দরা ও লংকা — এই পাঁচ কাণ্ড রামায়ণ-মাধব কন্দলী রচনা করেছিলেন। পদ, দুলড়ী, ছবি, ছন্দ রীতিতে রচিত, মাঝে মাঝে ঝুমুরী আছে। সর্বত্র অলংকার সমৃদ্ধ, কাব্যপূর্ণ, ভাবগম্ভীর শ্লোকে রচিত। এবারে কাণ্ড পঞ্চকের বহিরঙ্গ পরিচিতি দেওয়া যাক।

অযোধ্যাকাণ্ডের বিষয়ানুক্রম এই প্রকার — মিথিলা থেকে শ্রীরামাদির অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন, ভরত-শত্রুঘ্নের মাতুলালয়ে গমন, রামকে যুবরাজ পদে নিয়োগের জন্য প্রজাগণের অনুরোধ, অভিষেক আয়োজন, মন্থরার কুমন্ত্রণায় কৈকেয়ীর বর প্রার্থনা, রামের বনগমনে সম্মতি, লক্ষ্মণের ক্রোধ, কৌশল্যাকে রামের প্রবোধ, সীতা রামের অনুগমনের প্রার্থনা, রামের সম্মতি, লক্ষ্মণও বনগমনে প্রস্তুতি, বল্কল ধারণ, বন-যাত্রা। প্রজাদের এড়িয়ে রামের বনগমন, গুহমিলন, ভরদ্বাজ আশ্রমে রাম, সুমন্ত্রের অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন, দশরথের মৃত্যু, ভরতের কাছে দূত প্রেরণ, ভরতের অযোধ্যা আগমন, কৈকেয়ীর প্রতি ক্রোধ, শত্রুঘ্নের হাতে মন্থরার লাঞ্ছনা, কৌশল্যা-ভরত সংবাদ, রামকে ফিরিয়ে আনবার জন্য সদলে ভরতের বনে যাত্রা, গুহক-ভরত ভরদ্বাজাশ্রমে ভরত, চিত্রকূটে রাম-ভরত মিলন, রামের পিতৃতর্পণ, রাজ্যগ্রহণে রামের অসম্মতি, রামের পাদুকা সহ ভরতের প্রত্যাবর্তন ও নন্দীগ্রামে বাস। মোট ৩১টি শীর্ষকে — ৩৩টি পদ ও ৮টি দুলড়ী নিয়ে সাকুল্যে ১১২৬টি শ্লোকে অযোধ্যা কাণ্ড রচিত।

অরণ্যকাণ্ডের সুরু একদিকে ভরতের নন্দীগ্রামে বাস ও রামাদির অত্রি আশ্রমে প্রবেশ আখ্যান নিয়ে। তারপর রামের দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ, বিরাধ বধ, শরভঙ্গ মুনির দর্শন। সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রমে বাস, ধর্মভৃত্য মুনি কর্তৃক মন্দকর্নি মুনির বৃত্তান্ত কথন, ইল্বল-বাতাপি বৃত্তান্ত, অগস্ত্য আশ্রমে রাম, পঞ্চবটী বনপথে জটায়ুর সঙ্গে পরিচয়। শূর্পনখার নাক-কান ছেদন, রাম কর্তৃক ১৪ জন রাক্ষস এবং খরদূষণ বধ। শূর্পনখা রাবণের কাছে মারীচ রাবণ সংবাদ — রামের সঙ্গে বিবাদ করতে মারীচের নিষেধ, মায়ামৃগ রূপ ধারণ, রামচন্দ্রের মৃগানুসরণ, পরে সীতাকে একা রেখে লক্ষ্মণের গমন, তপস্বী বেশে রাবণের আগমন ও পরে পরিচয়

প্রদান, সীতার ভর্ৎসনা। সীতাহরণ, জটায়ুর বাধা দান, সীতার অভিশাপ, ব্রহ্মার আদেশে ইন্দ্রের সীতাকে পায়স দান। রাম লক্ষ্মণের সীতা অন্বেষণ, জটায়ুর কাছে সীতাহরণের সংবাদ জটায়ুর মৃত্যু ও অগ্নি সংস্কার। কবন্ধ সমাগম ও নির্দেশ রামলক্ষ্মণের চম্পা সরোবর দর্শন। অরণ্য পদ ১৪ টি, দুলাড়ী - ৪ টি, ছবি-২টি ঝুমুরী - ৩টি, মোট ২০ টি শীর্ষক শ্লোকসংখ্যা ৭৭৩। একটি সংস্কৃত শ্লোক আছে -

''কর্মণা বাধ্যতে বুদ্ধি র্নবুদ্ধ্যা কর্ম বাধ্যতে।
সুবুদ্ধিরপি রামাত্ময়ঃ হৈমং হরিণমন্বগাৎ

কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের মুখ্য বিষয় শ্রীরামের সহিত সুগ্রীবের মিলন, বালীর সঙ্গে সুগ্রীবের মনান্তরের কাহিনী। উভয়ের বন্ধুত্ব, রাম কর্তৃক বালী বধ, বালীর রামনিন্দা, তারার বিলাপ ও অভিশাপ, সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেক, সুগ্রীবের প্রতি রাম-লক্ষ্মণের ক্রোধ, সীতা অন্বেষণে সুগ্রীবের নানাদিকে সৈন্য প্রেরণ অঙ্গদের অসুর বধ বানর সৈন্যগণ স্বয়ং প্রভার আশ্রমে, বানরগণের সমুদ্রদর্শন ও সম্পাতি সাক্ষাৎ, সুপার্শ্বের সীতা ও রাবণকে দর্শনের বিবরণ। ১৮টি শীর্ষকে, ১৭টি পদ, ২টি দুলাড়ী, ৪টি ছবি ও ৩টি ঝুমরী সহ সাকুল্যে ৬০৩টি শ্লোকে কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড রচিত।

সুন্দরা কাণ্ডের মূল বিষয় বানরদের সমুদ্র লংঘনের মন্ত্রণা, হনুমানের জন্ম বিবরণ, হনুমানের লংকা যাত্রা, সুরমার সহিত সাক্ষাৎ, হনুর লংকা দর্শন, লংকাবর্ণনা, সীতা দর্শন, রাবণের সীতার প্রতি দুর্ব্যবহার বর্ণনা, সীতার সহিত হনুমানের কথাবার্তা, হনুমান কর্তৃক রাবণের মধুবন ধ্বংস ও জম্বুমালী বধ, অক্ষ-কুমার বধ, ইন্দ্রজিত কর্তৃক হনুমানের বন্ধন, লংকা দাহন, হনুমানের প্রত্যাবর্তনে বানরগণের আনন্দ, কপিসৈন্যের মধুবন ভঙ্গ, শ্রীরামের নিকট সীতার সমাচার, রামের লংকামুখি সসৈন্যে গমন। রাবণের প্রতি বিভীষণের হিতোপদেশ ও রাবণ কর্তৃক পদাঘাত। বিভীষণের রাম শিবিরে আগমন। মোট ২২টি শীর্ষকে, ২৫টি পদ, ১টি দুলাড়ী, ৫টি ছবি, ১টি ঝুমরী সহ সাকুল্যে ৮৫৪ টি শ্লোকে - সুন্দরা কাণ্ড রচিত।

লঙ্কাকাণ্ডের মূল বিষয় ক্রমবিবরণ এই প্রকার — রামের শিবির দর্শনান্তে শুক সারণ কর্তৃক সমাচার জ্ঞাপন, রাবণ রামের **কাটা** মুন্ড দেখান সীতাকে, ও সরমার প্রবোধ। রাবণের প্রতি মাল্যবন্তের উপদেশ সুষেণ পর্বত থেকে রামের লংকা দর্শন, অঙ্গদকে লংকার দূতরূপে প্রেরণ, ইন্দ্রজিতের যুদ্ধে রামলক্ষ্মণ নাগপাশে বন্দী, নাগপাশ মোচন, ধূম্রাক্ষ, অকম্পন, বজ্রদংষ্ট্র যুদ্ধ ও মৃত্যু, রাবণের যুদ্ধযাত্রা ও পরাজয়, কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ, যুদ্ধ ও মৃত্যু, অতিকায়াদির মৃত্যু, ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ রাম লক্ষ্মণের মূর্চ্ছা। হনুমান কর্তৃক ঔষধ আনয়ন, কুম্ভ, নিকুম্ভ ও মকরাক্ষ বধ। তৃতীয়বার ইন্দ্রজিতের যুদ্ধযাত্রা, সীতা বধ ও বিভীষণ কর্তৃক রামকে সান্ত্বনা। যজ্ঞভূমিতে আক্রমণ করে লক্ষ্মণ কর্তৃক ইন্দ্রজিত বধ। রাবণ সীতাকে বধ করতে উদ্যত। লক্ষ্মণের শক্তিশেল। হনুমানের ঔষধ আনয়ন গন্ধকালীর মুক্তি, কালনেমি বধ, লক্ষ্মণের জীবনলাভ ও গন্ধমাদন যথাস্থানে হনুমান কর্তৃক সংস্থাপন, রামরাবণের যুদ্ধ ও রাবণ বধ। বিভীষণের রাজ্যাভিষেক, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, রামচন্দ্রের অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন ও রাজ্যাভিষেক, হনুমানাদির স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ও রামের রাজ্য শাসন। ৩৪টি শীর্ষকে ৩০টি পদ, ১৭টি দুলড়ী, ১১টি ছবি সহ ১৮৭০ টি শ্লোকে লংকাকান্ড রচিত। লংকাকান্ড প্রারম্ভে "রামং লক্ষ্মণ পূর্বজং ও রাজেন্দ্র সত্যসন্ধং ইত্যাদি বিখ্যাত শ্লোক দুটি আছে।

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে সম্পূর্ণ তথ্য ও হিসাব গৃহীত হয়েছে 'হরিনারায়ণ দত্ত বরুয়া সম্পাদিত সপ্তকান্ড রামায়ণ, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৭২ থেকে। পালা শীর্ষকগুলি সম্পাদক কৃত বলেই মনে করি, শুধু কাহিনী বিস্তারে ও বিষয় নির্দেশে সহায়ক বলে এই সংখ্যা উল্লিখিত। লংকাকান্ডের প্রণাম সূত্রটি-ও যে সম্পাদক কর্তৃক প্রদত্ত তা বুঝা যায়। যাহোক এবার একটা মোটা হিসাবে দেখা যায় যে মাধব কন্দলীর রামায়ণে শ্লোক সংখ্যা (১১২৬ + ৭৭০ + ৬০৩ + ৮৫৪ + ১৮৭০) = ৫২২৩, পদসংখ্যা (৩৩ + ১৪ + ২৩ + ৩০) = ১১৯, দুলড়ি সংখ্যা (৮ + ৪ + ২ + ৯ + ১৭) = ৪০, ছবি সংখ্যা (০ + ৪ + ৪ + ৫ + ১১) = ২৪, ঝুমুরি সংখ্যা (০ + ৩ + ৩ + ১ + ০) = ৭। ইহাই সংক্ষেপে মাধব কন্দলীর রামায়ণের বহিরঙ্গ পরিচয়।

রামায়ণের বিশ্লেষণ

কাহিনীমূলক কাব্যের বিশ্লেষণে – (ক) কাহিনী বিন্যাস, (খ) চরিত্র সৃষ্টি, (গ) সামাজিক অবস্থার প্রতিফলন (ঘ) শিল্প সৌন্দর্য এবং (ঙ) বিশিষ্টতা – এই পাঁচটি বিষয়ে আলোচনা করলেই গ্রন্থের বা বিষয়ের মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ বিচার ও মূল্যায়ণ করা হয় বলে পন্ডিতগণ মনে করেন। আমরা এই ধারাটি অনুসরণের চেষ্টা করব।

রামায়ণ কাহিনী পরম্পরাগতভাবে আদি কবি মহর্ষি বাল্মীকির মানস থেকে উৎসারিত। এখানে কাহিনী বিন্যাসের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় – মুখ্যত: দুইটি – পরিবর্ধন ও সংযোজন। উত্তরকালের কবি বা অনুবাদক, তাঁর নিজস্ব রুচি, বুদ্ধি ও শিল্পধর্মের তাগিদে প্রাচীন কবির কোন কোন অংশ বর্জন করেন এবং নতুন কিছু কথার সংযোজন করেন। তাছাড়া নিজের অভিমত পরিমার্জনাও করে থাকেন। মাধব কন্দলী আদি কবির কাহিনী ধারা যথাসম্ভব অক্ষুন্ন রাখবার চেষ্টা করেছেন – মূল কাহিনী সংগঠনে কোন উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম দেখা যায় না। বস্তুত: মধ্যযুগের অনূদিত উত্তর পূর্বাঞ্চলের বলরাম দাস, কৃত্তিবাস, তুলসীদাস ও মাধব কন্দলীর মধ্যে – কন্দলীই সর্বাপেক্ষা বেশী মূলানুগ। তবে ক্ষেত্র বিশেষে বর্ণনার দৃষ্টিকোণ বিভিন্ন। বাল্মীকি রামায়ণে আছে যে দশরথ নিজেই রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করার কথা পূর্বে বলে পরে পুরু মন্ত্রী ও প্রজাদের অনুমোদন চেয়েছিলেন। মাধব কন্দলী কিন্তু প্রজাদের মুখ থেকেই রামচন্দ্রের যৌবরাজ্যের প্রস্তাব প্রথম এসেছে বলেছেন। পাছে রাম কোন আপত্তি করে এই আশংকায় বোধহয় দশরথ নিজের বার্দ্ধক্য, একটা দু:স্বপ্ন দর্শন ও রাহু-মঙ্গল যোগের ফলে অনিষ্টকর হতে পারে এই ভূমিকা করলেন –

স্বপ্নকে দেখিয়া বিচলিত মোর চিত।
ভূমিকম্পে নির্ঘাত পরিল পৃথিবীত।
দুই গ্রহ মন্দ মোর রাহুরে মঙ্গলে।
দৈবজ্ঞে গণিয়া মোত কহিল সকলে॥ (১৫৪৭)

তার পূর্বে কন্দলীর দশরথ রামকে রাজ্য শাসন ও রাজার কর্তব্য বলতে গিয়ে ছয়-গুণ, সাত সিদ্ধি ও অষ্ট অঙ্গের কথা বলেন। অযোধ্যাকাণ্ডের মূল বিষয় তিনটি — রামের অযোধ্যা ত্যাগ করে বনে যাত্রা। দ্বিতীয়টি বনের পথে রাম, তৃতীয় রামকে ফিরিয়ে আনার জন্য ভরতের উদ্যোগ। মন্থরা-কৈকেয়ী অংশটি গুরুত্বপূর্ণ। রামের যৌবরাজ্যের কথা শুনে আনন্দে কৈকেয়ী মন্থরাকে হার উপহার দিয়েছিলেন, মন্থরা সে হার ছুঁড়ে ফেলেছিল —

'ক্রোধত সেদিন কুজী অজ্জ্বল্য সমান।
আছারিয়া পেলাইলো কৈকেয়ীর দান॥

তারপর উঠল সপত্নীর প্রসঙ্গ, কৌশল্যা রাজমাতা তার অধীন থাকতে হবে।

দশরথ সাগর তরঙ্গী নদী তই।
অনপেতে শুখাই যাইবি জানলোহো মই।
প্রিয় গঙ্গা কৌশল্যা গম্ভীর বেগে বহে।
রাম অভিষেক বেকত করি কহে॥ (১৫৮০)

কৈকেয়ীর মতিভ্রম হয়। মন্থরার বুদ্ধিতে কাজ করলেন। কন্দলীর বর্ণনা সুন্দর। তারপর ঘটনাবলী স্বচ্ছ — অনুবাদ বলে মনে হয় না। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ দশরথ কৈকেয়ীর দুই বর —

"রামকে চৈধ্য বরিষক নাগি দিয়া বনবাস
করি যুবরাজ রাজ্যে আনিও ভরত।"

দশরথ মূর্চ্ছিত হলেন, কৈকেয়ীর হাতেপায়ে ধরলেন, কাজ হল না। বিলাপ করে রাত্রি ভোর হল দশরথের। রাজা রামকে দেখতে চান। সুমন্ত্র গেলেন রামের ভবনে। রামের প্রাসাদের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন কন্দলী "রামের প্রাসাদ সোভে কৈলাস সমান" বলে শুরু করে ১৬৪১ থেকে ১৬৫২ পর্যন্ত ১০টি শ্লোকে। রাম এলেন। দশরথ বিমনা, নির্বাক। রাম বললেন পিতার তৃপ্তির জন্য সবকিছু করতে পারেন।

নিশ্চে বোলো যদ্যপি বাপের আজ্ঞা পাঁও।
রাজ্য পরিহরি তেবে বনবাসে যাঁও॥ (১৬৯২)

তখন কৈকেয়ী দুইটি বরের কথা শোনালেন । দশরথ মূর্ছিত হলেন । রাম এলেন কৌশল্যার কাছে । কিছু পূজো দিলেন তিনি । রামের মুখে বনগমনের আদেশ শুনে — "গুরিত ছেদিল যেন বৃক্ষ হোয়ে ছিন্ন" — সেই ছিন্নমূল বৃক্ষের মতো অজ্ঞান হলেন মাতা । লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে দশরথকে বধ করতে চাইলেন — "বুঢ়ারে অগতে কাটি করে খণ্ড খণ্ড"। রাম শান্তভাবে ভ্রাতা ও মাতাকে বুঝালেন । অনেক তর্ক, আবেগ, অভিমানের পর রামের কথা মেনে নিলেন কৌশল্যা — রাজাকে সেবা করার জন্য অযোধ্যায় থাকিবেন । এবং রামকে বনে যাবার অনুমতি দিলেন তিনি । ছেলের কল্যাণে রক্ষাবন্ধন ও মঙ্গল অনুষ্ঠান করলেন । অযোধ্যাকাণ্ডে বাল্মীকি পঞ্চবিংশ সর্গে ৪৬টি শ্লোকে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন । এবং কৌশল্যা কেবল রামের জন্যই করেছেন কিন্তু কন্দলী সংলাপ পাঁচটি পদে রামলক্ষ্মণ দুজনের জন্যই উল্লেখ করেছেন ।

দেবতা পূজিয়া দেবী করি সমাপতি ।
মঙ্গল করিলা মন্ত্র জানিয়া সম্প্রতি ।। (১৮০৩)

রক্ষা বেঁধে দিলেন, দেবতার নির্মাল্য দিলেন মাথায় ।

ধৃতি স্মৃতি কীর্তি কান্তি সতী সরস্বতী
গতি মতি শান্তি আদি করি তুতি নাতি ।। (১৮০৪)
অসংখ্য রহস্য শাস্ত্র নিগম পুরাণ ।
ইতিহাস আদি করি করন্তো কল্যাণ ।।
সিংহ বাঘ ঘোড আদি কুঞ্জর মহিষ ।
রাক্ষস পিশাচ সর্পগণ - মহাবিষ ।। (১৮০৫)
বরাহ ভালুক গণ্ড গবয় সকল ।
ঋষভ প্রভৃতি করি করন্ত মঙ্গল ।। (১৮০৬)

ইত্যাদি মন্ত্রে রামলক্ষ্মণকে অভিসিক্ত করে —

পুত্র দুইকো কৌশল্যা কোলেকি লাগি নিলা ।
আপন পায়ুর ধূলি দুইরো মাথা দিলা ।। (১৮০৮)

এবার রামসীতা প্রসঙ্গ । রাম সীতাকে বললেন — গৃহে থেকে শ্বশুর শাশুড়ির সেবা করতে । বনে কষ্ট হবে, জন্তুজানোয়ার আছে - ইত্যাদিও বল্লেন । বাল্মীকি রামসীতা প্রসঙ্গটি ২৬ থেকে ৩০ পর্যন্ত ৫টি সর্গে মোট ১৫৮ টি শ্লোকে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন — মিনতি, ভর্ৎসনা, শ্লেষ, ব্যঙ্গ, আকুতি, অভিমান, অশ্রু নিষেক, রতি ভাবের বিচিত্র সম্ভারে এই অংশটি মনোরম । কিন্তু কন্দলী প্রসঙ্গটি আলোচনা করেছেন মাত্র ১৬ টি দুলড়ী ও ৩৭টি পদ মোট ৫৩টি শ্লোকে । কিছু অংশের সহজ অনুবাদ আছে । যেমন —

ভর্তুর্ভাগ্যন্তু নার্যেকা প্রাপ্নোতি পুরুষর্ষভ ।

ইত্যাদির অনুবাদ

স্বামীর সুকৃতি ভুঞ্জে পতিব্রতাজন ।
প্রভুর লাগিত আর শোকে যাইব বন ॥ (১৮৪৭)
বনক যাইন্তে আগে মিলিবেক যত ।
ভাঙ্গিয়া কণ্টক বন চলিবো আগত ॥ (১৮৪৮)

কন্দলী সাবিত্রী প্রমুখ সতী নারীর প্রমাণ ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ যুক্তির কথা বলেন নি সহজ সরলভাবে বলেছেন — কন্দলীর সীতা

তুমি এরি গৈলে মোর জীবন নিষ্ফল ।
কটাক্ষ ভব নুহি তুমিত্ব গবল ॥ (১৮৬৩)

বাল্মীকির সীতার উক্তি —

যদিমাং দুঃখিতামেবং বনং নেতুং ন চেচ্ছসি ।
বিষমগ্নিং জলং বাহমাস্থাস্যে মৃত্যু কারণাৎ ॥ (২১।১১)

কন্দলী এখানে -- রামের জবানী

মুখচন্দ্র মরি অমৃতর অভিলাষে ।
প্রসিবাক লাগি রাহু আসি (ভলাপাশে ॥

ইত্যাদি (১৮২৮ - ১৮৩৫) আটটি পদ শ্লোকে — সীতার রূপযৌবনের বর্ণনা দিয়েছেন ।

আবার সীতার জবানী –

চৈধ্যয় বরিষ লাগি তুমি বন যাইবা ।
ইন্দ্রসম লাগি মোর যানে বুরুয়াইবা ॥
চম্পক কলিকা যেন মোর কলেবর ।
নিন্তি ফুন্ডি আছিলাহা যেহ্নো ভ্রমর ॥ (১৮৩১)

ইত্যাদি শৃঙ্গার রস সর্বস্ব আবেদন প্রাধান্য পেয়েছে । তা সাধারণ তরুণ তরুণীর ক্ষেত্রে অবশ্যই সুন্দর ও বাস্তব, কিন্তু রাম-সীতা সম্বন্ধে এর ঔচিত্য প্রশ্নাতীত নয় ।

যাহোক রাম সীতাকে বনে সঙ্গে যেতে অনুমতি দিলেন । লক্ষ্মণ-ও অনুমতি পেলেন রামের সঙ্গে যেতে । তারপর কাহিনী বাল্মীকির ধারায় প্রবাহিত । বনগমন কালে কৌশল্যা সীতাকে বলেছিলেন যে বনবাসী দরিদ্র স্বামীকে যেন সীতা উপেক্ষা না করেন । বাল্মীকির সীতা বলেছিলেন –

না তন্ত্রী বিদ্যতে বীণা না চক্রো বিদ্যতে রথঃ ।
না পতিঃ সুখমেধেত যা স্যাদপি - শতাত্মজা ॥
মিতং দদাতি হি পিতা মিতং ভ্রাতা মিতং সুতঃ ।
অমিতস্য তু দাতারং ভর্তারং কা ন পূজয়েৎ ।। (২৯।৩০)

কন্দলীর অনুবাদ –

সুস্বামী থাকন্তে শোভে সবে অলংকার ।
স্বামীহীন হৈলে হোয়ে সবে ছারখার ॥
পরিমিত ধন মাত্র দেন্ত বাপ ভাই ।
পুত্রত থাকিলে ধন হাতে তো না পাই ॥
স্বামীর ধনক সুখ ভোগে করে দান ।
কোন নারী করয় স্বামীক অপমান ॥
কোকিল শোভন হোয়ে সুশোভন রায়ে ।
নারীগণ শোভে পতিব্রতা ধর্ম ভাঁয়ে ॥
পুরুষ শোভন গুণ সদবিদ্যা ভারে ।
তাপস শোভন হোয়ে ক্ষমা অলংকারে ॥ (১১৪২-৪৪)

লক্ষণীয় যে শেষের দুই চরণ অপ্রাসঙ্গিক হিতোক্তি। সুমিত্রার বিখ্যাত উক্তিটি — লক্ষ্মণের প্রতি —

রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম্ ।
অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত যথাসুখম্ ॥ (৪০। ৯)

কন্দলী —

সীতা জেনে মই সম রাম দশরথ ।
অবিরোধে চল বনে কল্যাণের পথ ॥ (১৯৫৭)

তারপর সুমন্ত্রের রথে বনগমন এবং প্রথম রাত্রি তমসা নদীতীরে তৃণ-শয্যায় রাম-সীতা। শেষ রাত্রে অযোধ্যাবাসীদের বিভ্রান্ত করে সরযূ পার হয়ে শৃঙ্গবের পুরে গুহ মিলন। পরদিন গঙ্গাপার হলেন। সুমন্ত্রকে বিদায় দিলেন। গঙ্গার কাছে সীতার প্রার্থনাটি নারীহৃদয়ের চিরন্তন মাধুর্যে ভরা। চতুর্দশ বৎসর পরে স্বামীদেবর সহ ফিরে এসে —

গবাং শত সহস্রঞ্চ বস্ত্রাণ্যন্নঞ্চ পেশলম্ ।
ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদাস্যামি তব প্রিয় চিকীর্ষয়া ॥
সুরাঘটসহস্রেণ মাংস ভূতোদানেন চ ।
যক্ষ্যে ত্বাং প্রীয়তাং দেবি পুরীং পুনরুপাগতা ॥
(সর্গ ৫২। ৮৮-৮৯)

কন্দলী দ্বিতীয় শ্লোকটি বর্জন করে লিখেছেন —

অযোধ্যাক আসিলে করিবো বহু মান ।
তোমার উদ্দেশ্যে দিব সহস্র গোদান ॥ (২০৪৮)

অযোধ্যায় ফিরে গেলেন সুমন্ত্র কাঁদতে কাঁদতে আর রাম গেলেন প্রয়াগে ভরদ্বাজ আশ্রমে। সেখান থেকে চিত্রকূট পর্বত ও বনে। শীত ঋতুর অবসানে বহু পুষ্প সমৃদ্ধ বনের সৌন্দর্যে তিনজন প্রফুল্ল হলেন। দুই ভাই মিলে কুটির নির্মাণ করে বাসের ব্যবস্থা করলেন। চিত্রকূট বর্ণনা আছে। বাল্মীকি রাম চিত্রকূটের গাছ,

ফুল, পত্রশোভার পরিচয় দিয়েছেন ৬।৭টি শ্লোকে (৫৬ সর্গ ৬-১০) কিন্তু এই বর্ণনাটির অনুবাদ দিয়েছেন কন্দলী নিজের মতো করে ১৫টি পদে নিপুণভাবে মাঝে মাঝে শৃঙ্গার রসের ফোড়ন দিয়ে —

জাই যুতী বকুল বন্দুলি কর্ণিকার ।
কাঞ্চন তগর কুন্দ কেতকী মন্দার ॥
*** *** ***
রাজহংস দেখা সীতা তোমার গমন ।
চক্রবাক যুগল তোমার দুই তন ॥
কলহংস রাব কান্তি নূপুরর নাদ ।
বদন উপরে তোর দেখন্তে আহ্লাদ ॥ (২০৮০)

অযোধ্যা কাণ্ডের দ্বিতীয় পর্যায় অযোধ্যা । সুমন্ত্রের প্রত্যাবর্তন, অন্ধ মুনির অভিশাপ কাহিনী সংলাপ বিবৃত হয়েছে । বাল্মীকির দশরথের বুকফাটা আর্তনাদ —

হা রাঘব মহাবাহো হা মমায়াসনাশন ।
হা পিতৃপ্রিয় মে নাথ হা অদ্যাসি গতঃ সুতঃ ॥ (৬৪।৭০)

কন্দলীর পাঁচটি পদে প্রতিধ্বনিত —

মরণ কালত রাম না দেখিলো তোক ।
মম কয়নকো গৈলে নেরাই বোহো শোক ॥
*** *** ***
তাক দেখিবাক কপালেত ভাগ্য নাই ।
পুত্র শোকে হেরা মোর প্রাণ দুটি যায় ॥
হা রাম বুলিয়া শয্যাত এরি গায় ।
ভৈলন্ত নিশ্চেষ্ট সদা বিমোহিত ভায় ॥
বনত যাইবার ছয়দিন ভৈল কাল ।
মধ্য নিশা ভৈল মরিলন্ত মহীপাল ॥ (২১৮৩-৮৬)

তারপর শোক, ক্রন্দন - গুরু অমাত্যের সভা । তৈলদ্রোণীর মধ্যে দশরথের দেহ রেখে- ভরতকে নিয়ে আসবার জন্য দ্রুতগামী দূত পাঠানো গেল । ভরত দুঃস্বপ্ন দেখেছেন — পিতা গোময় হ্রদে পড়ে গেছেন, সাগর শুষ্ক, চন্দ্র ভূপতিত, পিতা কৃষ্ণবসন পরে রক্তমালা ধারণ করে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছেন । স্বপ্নে পিতর দ্রাক্ষ ইত্যাদি ৯টি শ্লোকে (৬৯।৮ - ১৬) রচিত বাল্মীকি রচনার সুন্দর ও যথাযথ অনুবাদ করেছেন কন্দলী ৫টি দুলড়ীতে —

আকাশ ছানিয়া দেখিলো সম্পূর্ণ
পরিল চন্দ্র ভূমিত ॥
আওর দেখিলো সাগর শুকাইল
রাহুরে গ্রাসিল সুর ।
বিনা মেঘে আসি নির্ঘাত পরিয়া
যেন ভূমি হইল চুর ॥
আমার পিতৃর শরীর দেখিলো
রক্ত বস্ত্র আনি দিল ।
খির নুহি কায়া খাটিত বসাইয়া
দক্ষিণক লাগি নিল ॥ (২২২১ - ২২২২)

বাল্মীকি লিখেছেন "কৃষ্ণ বাসকম্" (৬৯।১৪) কন্দলী "রক্ত বস্ত্র" । বাল্মীকির ''রক্ত মাল্য'' (৬৯।১৫) অনুবাদ "রাতুল পুষ্পর মালা" (২২২৪) লিখেছেন কন্দলী । মনে হয় এখানে দুটি লাল রং হবার কারণ — কবির লৌকিক সংস্কারের জন্য । আর একটি বিশেষ বাল্মীকির ভরত আশংকা করেছিলেন যে ভরত নিজে পিতা, রাম বা লক্ষ্মণ একজনের মৃত্যুকাল সমাগত — "অহং রামোহথবা রাজা লক্ষ্মণো বা মরিষ্যতি ।" (৬৯।১৭) । কিন্তু কন্দলীর ভরত বলেছেন —

লয় মোর মন নোহে বা জীবন
তেজিলেন্ত মহীপাল ॥ (২২২৪)

যাহোক অযোধ্যার দূতরা সকলে ভাল আছেন জানিয়ে ভরত শত্রুঘ্নকে নিয়ে চলে আসায় কৈকেয়ী সানন্দে পুত্রকে আহ্বান করে রামের বনগমন, ভরতের রাজ্যলাভ ও দশরথের মৃত্যুর খবর দিলেন । ভরত অত্যন্ত দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে কৈকেয়ীকে যে তীব্র ভর্ৎসনা করেছিলেন — বাল্মীকির সেই উক্তির আক্ষরিক অনুবাদ করেন নি কন্দলী — তবে ভাবটিকে সম্পূর্ণ বজায় রেখে লিখেছেন - নিজের ভাষায় —

শূর্ষিণী নাশিণী নিকারুণী সংহারিণী ।
নির্দয়িনী রাক্ষসিণী বাঘিনী দারুণী ॥
যক্ষিণী ডাইনি তই সুস্বামী ভক্ষিণী ।
পিশাচিনী আরে রান্ডী ভৈলী অলক্ষিণী ॥ (২২৭৭-৭৮)

শত্রুঘ্নর হস্তে কুব্জার লাঞ্ছনার দৃশ্যটি বাল্মীকি বলেছেন ৭৮তম সর্গে । লিপ্ত চন্দনা, রাজবস্ত্র পরিধানা, বিবিধ রত্নালংকারে ভূষিতা — 'বধ্বা রজ্জুভিরিব বানরী' — অর্থাৎ পোষাক পরা বানরীর মতো কুব্জাকে প্রহরী শত্রুঘ্নর হাতে তুলে দেয় । শত্রুঘ্ন তাকে টেনে নিতে থাকে । সাধারণ ক্রোধের ব্যাপার । কিন্তু কন্দলী কাহিনীটিকে অধিকতর কৌতুককর প্রকাশ করেছেন । সুসজ্জিতা কুব্জার মনের ভাব ও উক্তি —-

বয়সত বর যই ভরতত করি ।
কামবশ ভৈলে সিটো দোষক ন ধরি ।
বিদিতে কুসারে যেবে নাহ্ন কিছু করি
পুন্তরূপে তথাপিতো হৈয়ো পটেশ্বরী ॥ (২২৮৭-৮৮)

ভরত রাজা হবে এবং সেটা তার-ই বুদ্ধিতে ও কৌশলে এ গর্ব স্বাভাবিক । সাজসজ্জা অলংকারাদি পরিধান করা - যেটা বাল্মীকি দেখিয়েছেন — সেটাও স্বাভাবিক । কিন্তু ভরতের ধাত্রীমাতার মতো কুব্জার চিন্তায় ও আচরণে বিকৃত কামভাবের প্রকাশও পটেশ্বরী হবার সাধ — ভয়াবহ ও বিকৃত রুচির পরিচয় । কৌতুক রস সৃষ্টির এই স্থূল প্রয়াস পীড়াদায়ক ও সুরুচির বাধক হয়নি কি ?

যাহোক কৌশল্যার সঙ্গে ভরতের সাক্ষাৎ, প্রেতকার্য, ভরতের রাজ্য গ্রহণের অস্বীকৃতি এবং রামচন্দ্রকে ফিরিয়ে আনার জন্য যাত্রার বর্ণনা মূলানুসারী। রামের বনবাস ব্যাপারে ভরত যে কিছুই জানেন না সেটি কৌশল্যার কাছে সপ্রমাণ করতে অনেক পাপের উল্লেখ করে ভরত শপথ বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন। ৭৫তম সর্গে বাল্মীকি পাপ ও নরকের একটি সুদীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন। কন্দলী মাত্র দুটি পদে (২০১০-১৪) মাত্র মিথ্যা কথা, ব্রাহ্মণবধ, গোহত্যা, গুরুপত্নীগমন, রাজদ্রোহ এই জাতীয় কয়েকটি পরিচিত পাপের উল্লেখ করে মাত্রা জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। যেমন

"যোহোয় কপট যেবে সত্য পটুয়াওঁ।
মিছা যবে বোলো ব্রহ্মবধ পাপ পাওঁ॥
দশ কপিলাক মারো গুরুভার্যা হরো।
রামক পঠাইলো বনে আত্মঘাত করো॥ (২০১২-১৩)

যাথার্থ্য প্রমাণের জন্য শপথ উচ্চারণ করা, ভারতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। বাল্মীকি প্রয়োজনে সংযতভাবে শপথ বাক্যের কথা বলেছেন। কিন্ত কন্দলী এ ব্যাপারে সমধিক উদার ছিলেন। যেমন দশরথের আদ্য শ্রাদ্ধের পর অমাত্যগণ ও বশিষ্ঠ ভরতকে রাজ্য গ্রহণের অনুরোধ করায়, ভরত দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন যে বংশের জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রই ন্যায্যত: সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। যদি অনার্যোচিত এই কর্ম ভরত করেন তবে ভুলকারূপে নিন্দার্হ হবেন।

অনার্য জুষ্টমস্বর্গ্যং কুর্য্যাং পাপমহং যদি,
ইক্ষাকূনামহং লোকে ভবেয়ং কুলপাংশন॥ (৮২।১৪)

কন্দলী এখানে ভরতকে দিয়ে শপথ বাক্য উচ্চারণ করিয়েছেন —

করোহো শপত গুরু তোমার অগ্রত।
তুমি হেন সহস্র ব্রাহ্মণ করো হত॥
সহস্র কপিলা মারো গঙ্গার তীরত।
পূর্ব পুণ্য আছে যত নিয়ো হোক হত॥
গোহত্যা, সুরাপান, অগম্যা গমন।

মহাপাপ ব্রাহ্মণর সুবর্ন হরণ ॥
ইসব প্রমুখ্যে পাপ করো নিরন্তর ।
যেবে মই দ্রোহ চিন্তি আছো হো রামর ॥ (২০৭০-৭১)

এমন একটি কথা আছে গুহর কাছেও । সৈন্য সামন্ত সহ ভরত শৃঙ্গবের পুরে রাম সুহৃদ গুহর কাছে গেলে গুহ সন্দেহ করেছিলেন যে ভরত রামের ক্ষতি করতে এসেছেন বুঝি । ভরত বলেছিলেন যে রাম তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য তাঁকে ফিরিয়ে নিতেই তিনি এসেছেন — অন্য কোন মতলব নেই, এটি সত্য কথা ।
"বুদ্ধিরণ্যা ন মে কার্যা গুহ সত্যং ব্রবীমি তে ।" (অযোধ্যা ৮৫।১০)
কিন্তু এ স্থলেও কন্দলী ভরতের মুখে শপথ বাক্য দিয়েছেন —

পিতৃতুল্য শ্রীরামক আনিবাক যাঁও ।
মিছা যদি বোলো ব্রহ্মবধ পাপ পাওঁ ॥ (২৪১৫)

ভরদ্বাজাশ্রমে সসৈন্য ভরতের প্রতি যে আতিথ্যের বর্ণনা করেছেন বাল্মীকি ৯১তম সর্গে, কন্দলী তার যথাযথ সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন ।

দশরথের পাটরাণীদের পরিচয় করিয়ে দেবার সময় — কৈকেয়ী সম্বন্ধে ভরতের উক্তিটি উল্লেখযোগ্য —

ক্রোধনামকৃতপ্রজ্ঞাং দৃপ্তাং সুভগমানিনীম্ ।
ঐশ্বর্য কামাং কৈকেয়ীমনার্যামার্য রূপিণীম্ ।
মমৈতাং মাতরং বিদ্ধি নৃশংসাং পাপনিশ্চয়াম্ ॥
যতো মূলং হি পশ্যামি ব্যসনং মহদাত্মনঃ । (৯২।২৬-২৭)

কন্দলীর অনুবাদ —

কলহত প্রিয়া এহো প্রচন্ড প্রভাও ।
কৈকেয়ী নামত আমি চন্ডালের মাও ॥
রাম হেন ভাতৃক দিলেক বনবাস ।
ইহানে কারণে ভৈল বাপর বিনাশ ॥
জন্মান্তরে কতেক পাতক মই কৈলো ।
সি কারণে - আন গর্ভে উতপতি ভৈলো ॥ (২৪৮৩-৮৪)

এর পরের দৃশ্যটি চিত্রকূটের যেখানে ছিলেন রাম-লক্ষ্মণ ও সীতা। সৈন্য কোলাহল শুনে লক্ষ্মণ গাছের মাথায় চেপে অযোধ্যার সৈন্য ও ভরতকে দেখলেন এবং ভরতের কুমতলব সম্বন্ধে ক্রোধ প্রকাশ করলেন। কিন্তু ভরতের সদিচ্ছা ও মহৎ চরিত্রের কথা জানালেন রাম। কন্দলীর অনুবাদ গাম্ভীর্যে কিছুটা কম হলেও যথাযথ। কিন্তু এখানে কন্দলী - রাম সীতার বিহার ও জয়ন্ত কাকের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এটিও বাল্মীকির-ই উক্তি এবং তা করা হয়েছিল সুন্দরা কাণ্ডে ৩৮তম সর্গে। অশোক বনে সীতা রামকে অভিজ্ঞান দেবার জন্য - এই একান্ত কাহিনীটি হনুমানকে বলেছিলেন। কন্দলীও সুন্দর কাণ্ডে এটি উল্লেখ করেছেন সংকেত বচন হিসাবে ---

চিত্রকূটে শুইল মোর উরুত সিথানে।
কাকে মোত তনে মায় করিলেক টানে ॥ (৪৩৩৫)

মনে হয় কাহিনীর ধারা অব্যাহত রাখতেই কন্দলী - এই নাটকীয় ঘটনাটি পূর্বে উল্লেখ করেছেন।

পরবর্তী ঘটনা ভরতের সঙ্গে রামচন্দ্রের সাক্ষাৎ, পিতার মৃত্যু সংবাদ, শোক, গঙ্গায় তর্পণ, ইঙ্গুদী ফলের পিণ্ডদান, রাজপদ গ্রহণের জন্য ভরতের প্রার্থনা, রামের বিচার, জাবালির উপদেশে রামের উত্তেজনা, ভরতকে পিতৃআজ্ঞা পালনের নির্দেশ, রামের প্রতিনিধি রূপে ভরতের বনবাস প্রার্থনা শেষে রামের পাদুকা নিয়ে সিংহাসনে রেখে জটাজুট ধরে ভরতের রাজ্য করার কথা এবং পাদুকা নিয়ে ভরদ্বাজ আশ্রম হয়ে নন্দীগ্রামে প্রত্যাবর্তন। কাহিনীর ক্রম ও ধারা কন্দলী সংক্ষেপে অনুসরণ করেছেন। তবে স্বাভাবিক কারণে-ই মূলের ভাবগাম্ভীর্য যুক্তির প্রখরতা রক্ষিত হয়নি। অধিকন্তু যুক্তি, অনুমানাদি ছাড়াও ভরত রামচন্দ্রকে ফিরিয়ে নিতে — ভূমিতে কুশ বিছিয়ে যে প্রত্যুপবেশন করেছিলেন অর্থাৎ ধর্না দিয়েছিলেন সেই সুন্দর চিত্রটি কন্দলী বাদ দিয়েছেন কেন কে জানে ? অভিমানাহত ভরতের প্রতিবাদ চিত্রটি বাল্মীকির রচনায় অনুপম।

ইহ তু স্থণ্ডিলে শীঘ্রং কুশানাস্তর সারথে।
আর্যং প্রত্যুপবেক্ষ্যামি যাবন্মে সম্প্রসীদতি ॥
নিরাহারো নিরালোকো ধনহীনো যথা দ্বিজঃ।
শয়ে পুরস্তাচ্ছালায়াং যাবন্মাং প্রতিযাস্যতি ॥ (১১১।১৩-১৪)

যাহোক রামের বিখ্যাত উক্তিটির যথার্থ অনুবাদ দিয়েছেন কন্দলী — বাল্মীকির রাম ভরতকে শেষ কথা বলেন —

লক্ষ্মীশ্চন্দ্রাদপেযাদ্বা হিমবান্ বা হিমং ত্যজেৎ ।
অতীয়াৎ সাগরো বেলাং ন প্রতিজ্ঞামহং পিতুঃ ॥
কাম্যাদ্বা তাত লোভাদবা মাত্রা তুভ্যমিদং কৃতম্ ।
ন তন্মনাপি কর্তব্যং বর্তিতব্যঞ্চ মাতৃবৎ ॥ (১১২।১৮-১৯)

কন্দলীর রামের উক্তি —

পূর্ণচন্দ্রমার কান্তি হরয় সকল ।
যেবে শুকাই পরে সাত সাগরর জল ॥
পাতাল পর্যন্তে সাতো পৃথিবী নশয় ।
মেরু মন্দরক আদি পর্বত খসয় ॥
সূর্য আদি গ্রহগণ খসি ভূমিত পরিব ।
তথাপিতো আমি পিতৃবাক্যক নেরিব ॥
প্রাণর সংশয় যেবে মিলয় আমার ।
তথাপি তো ন যাইবে মোহোর অঙ্গীকার ॥ (২৫৭৮ - ৭৯)

* * *   * * *   * * *

কৈকেয়ী মারে মন্দ চিন্তিলা আমাক ।
মোর দৈবে আছে কোনে স্বাধিবেক তাক ॥
তাঙ্ক কোপ ন করিবি দেখোহো সঙ্কাত ।
এতিক্ষণে মোহোর মাথাত দেশ হাত ॥ (২৫৮১ - ৮২)

তারপর রামের পাদুকা মাথায় করে ভরতের নন্দীগ্রামে প্রত্যাবর্তন —

পানৈ যুবি নিয়া   পাটত বৈসায়া
তাঙ্ক রাজা ভরে দিল ।
জয় জয় রাম   বুলি প্রজা সবে
আনন্দ অতি কবিল ॥   (২৬০১)

* * *   * * *   * * *

যত শিষ্ট শান্ত   জন পালিলন্ত
দুষ্টক দন্ডি সর্বথা ।
এহিস্থানে আবে   ভৈলা সমাপতি
অযোধ্যা কান্ডর কথা ॥   (২৬১২)

বাল্মীকি অযোধ্যা কান্ড সমাপ্ত করেছেন ১১৯টি সর্গে । কন্দলীর শ্লোক সংখ্যা ১১২৬ । তার মধ্যে পদ ৯৯৮ আর দুলড়ী ১২৮ ।

অরণ্য কান্ড

বাল্মীকি রামায়ণে অযোধ্যা কান্ডের শেষে চার সর্গে (১১৬-১১৯) রামচন্দ্রের চিত্রকূট ত্যাগ করে অত্রি আশ্রমে প্রবেশ এবং সীতা-অনসূয়া সংবাদ বর্ণিত হয়েছে । কিন্তু কন্দলী এই অংশ দিয়ে অরণ্যকান্ড সুরু করেছেন । প্রথম বিরাধ বধ, তারপর শরভঙ্গ মুনির আশ্রম । মুনি রাম দর্শন করে যজ্ঞাগ্নিতে দেহ নিক্ষেপ করলেন । তাঁর নির্দেশে রাম এলেন সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রমে । পঞ্চ অপেশ্বরী সরোবর (পঞ্চাপ্সার সরোবর) ও মন্দকর্ণি (মান্ডুকার্ণি) ঋষির আশ্রম । এইসব বনে রাম লক্ষ্মণ সীতা দশ বৎসর কাটিয়ে আবার ফিরে এলেন সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রমে ।

দশম বরিষ যেবে ভৈল নিবর্তন ।
পুনরপি সুতীক্ষ্ণ মুনিয় দরশন ॥ (২৭৫৫)

সুতীক্ষ্ণ ঋষি রামচন্দ্রকে অগস্ত্যাশ্রমে যাবার নির্দেশ দিলেন এবং ইল্বল ও বাতাপি রাক্ষস যুগলকে অগস্ত্য কী ভাবে বধ করেছিলেন তা শোনালেন । অগস্ত্যের ভ্রাতার আশ্রম হয়ে অগস্ত্যের আশ্রমে গেলে রামচন্দ্রকে অগস্ত্য দিব্যধনু অক্ষয় তূণ দিলেন । বাল্মীকি বলেছেন বিশ্বকর্মা নির্মিত বৈষ্ণব ধনু, ব্রহ্মদন্ড শর, অক্ষয় তূণ যুগল ও সুবর্ণ নির্মিত তরবারি দিয়েছিলেন । কন্দলীর ভাষায় —

এহি ধনু বিষ্ণুরে থাপিয়া দেবরাজ ।
অসুরক দেখিয়া স্বর্গর কৈলা বাজ ॥
ব্রহ্মায়ে সৃজিলা অস্ত্র শত্রু ভেদি যাই ।
যাহাক হানিলে শর ব্যর্থক ন যায় ॥

বিশ্বকর্মা গড়িলেক অনেক যতনে ।
বাসবে দিলন্ত যোক কৌতূহল মনে ॥
ধনুর্বাণ ভরে বসুমতী নোহে স্থির ।
ত্রিভুবন বিজয়ী তুমি হি মহাবীর ॥
ধনুর্বাণ রামে যেবে শিরত চড়াইল ।
আকাশ নির্মল আরো খড়োক পাইল ॥ (২৭৭৮-৮০)

তারপর বাল্মীকি যা বলেন নি — কন্দলী বলেছেন - রামের ধনুক দেখে লক্ষ্মণও মুনির কাছে একখানি চাইলেন ।

হেন কথা শুনি মুনি হাসিচুলি লন্ত ।
দিব্য ধনুখান আনি তাহাক দিলন্ত ॥ (২৭৮৪)

তারপর অগস্ত্যের নির্দেশে পঞ্চবটী গেলেন তাঁরা । পঞ্চবটীতে সাক্ষাৎ পেলেন জটায়ুর। শরৎকাল গেল এল হেমন্ত কাল । বাল্মীকি সুদীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন কিন্তু কন্দলী ঋতু বর্ণনায় আগ্রহী নন । পরবর্তী শূর্পনখার কাহিনীটি তিনি বর্ণনা করেছেন বাল্মীকির ধারায় । বর্ণনা করেও কিন্তু নিজস্ব কল্পনায় শূর্পনখার মুখে লক্ষ্মণের রূপযৌবনের সুদীর্ঘ মৌলিক বর্ণনা দিয়েছেন ।

শূর্পনখা বোলে শুন লখাই মহাবীর ।
কামদেব যেন শোভে তোমার শরীর ॥

ইত্যাদি ২৮১৭ থেকে ২৮২২ ছয়টি পদে তরুণ পুরুষের কামোদ্রেককারী রূপের বর্ণনা কবিত্বপূর্ণ । উল্লেখযোগ্য যে বাল্মীকি কেবল একটি শ্লোক দিয়েছিলেন শূর্পনখার মুখে ।

অস্য রূপস্য তে যুক্তা ভার্যাহং বরবর্ণিনী ।
ময়াসহসুখং সর্বান দণ্ডকান বিচরিয়সি । (১৮।৭)

কন্দলীর শূর্পনখার উক্তি —

দণ্ডকার বন তিনি ভুবনত সার ।
ইহাত রমণ হোক তোমার আমার ॥

যে হেন নদীর জল নআক্ষরহি ।
সেহিমতে নরর যৌবন যায় বহি ।। (২৮২২-২৩)

তারপর কাহিনীর অনুরূপ বিন্যাস । সীতাকে আক্রমণ করলে রামের নির্দেশে লক্ষ্মণ শূর্পনখার নাক কান কেটে দিলেনখড়্গ দিয়ে । শূর্পনখা খরদূষণের কাছে ছুটে গেল । ১৪ জন বীর পাঠালো খরদূষণ । রামের হাতে মারা গেল তারা । শূর্পনখা ভর্ৎসনা করে খরদূষণকে পাঠান । পরে দূষণ, ত্রিশিরা ও খর রামের হাতে হত হন ।

বাল্মীকি রামায়ণে আছে যে রাবণ-খরদূষণ বধ ও সীতার রূপের কথা প্রথম শুনেছিলেন অকম্পন নামে রাক্ষসের মুখে । সীতাহরণের বুদ্ধি অকম্পনই রাবণকে দেয় । কামার্ত রাবণ বনে যান তারকানন্দন মায়াবী মারীচের কাছে । সীতাহরণের প্রস্তাব শুনে মারীচ রাবণকে বারণ করেন এবং ফল খারাপ বলেন । রাবণ ফিরে আসেন লংকায় । কন্দলী অকম্পন অংশটি সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছেন ।

শূর্পনখা খরদূষণের মৃত্যু, রামলক্ষ্মণের কথা বিশেষ করে সীতার অনিন্দ্য রূপের কথা জানাল । শূর্পনখা নাক-কান কাটার কারণ কি ? বাল্মীকির শূর্পনখা সম্পূর্ণ মিথ্যা করে বলেছে যে সীতাকে রাবণের জন্য ধরে আনার চেষ্টা করেছিল সে তাই লক্ষ্মণ নাক কান কেটে দেয় –

তান্তু বিস্তীর্ণজঘনাং পীনোত্তুঙ্গ পয়োধরাম্ ।
ভার্যার্থেতু ত্বানেতুমুদ্যতাহং বরাননাম্ ।
বিরূপিতাস্মি ক্রূরেণ লক্ষ্মণেন মহাভুজঃ ।। (১৪।২১)

কন্দলীর শূর্পনখার উক্তি –

কোল চাপিলোহো মই ভুঞ্জিবাক মনে ।
ধরিনাক কান মোর কাটিল লক্ষ্মণে ।। (৩০১০)

রাবণ চললেন মারীচের কাছে । বাল্মীকির মতে দ্বিতীয়বার । মারীচ বুঝান রামের শৌর্যের কথা । এবং এই কার্যের নিন্দার কথা বলেও সীতাহরণে সাবধান করন রাবণকে –

আসন্ন কালত আসি বিনাশন বুদ্ধি ভৈল
মাথে তোর যমকাল নাচে ।
অগণির শিখাসম সীতাক হরিতে চাস
মরিবার কতকাল আছে । (৩০৩১)

তারপর কন্দলীর মারীচ বলল সম্পূর্ণ নতুন কথা । ভাই বিভীষণ ও বহিনী ত্রিজটার সঙ্গে এ ব্যাপারে পরামর্শ করতে —

তোর হিত লক্ষ ত্রিজটা বহিনী
হিত বিভীষণ ভাই ।
দুই হন্তত পরে লংকার ভিতরে
তোর ইষ্ট কেহো নাই ॥ (৩০৫৩)

লক্ষণীয় যে কন্দলীর মতে মারীচ রাবণের মমাই আর ত্রিজটা বহিনী । যাহোক তারপর মারীচ নিজের স্মৃতিচারণ করে বালক রামের বিক্রম ও দন্ডকে যুবক রামকে আর একবার আক্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে রাবণকে নিবৃত্ত করতে পারল না । আদেশ না শুনলে মারীচের প্রাণদন্ড হবে তাই –

রামতো মারিবো মারিবোহো রাবণত ।
জীবন নাহিকে হেন গুণিলো মনত ॥
তোহর হাতত কিয় প্রাণক সুজাওঁ ।
রামর হাতত পরি স্বর্গে চলি যাওঁ । (৩০৬৪)

বাল্মীকির মারীচের উক্তি একটু আলাদা । রাম আমায় বধ করবেন আমি কৃতকৃত্য হব, তোমাকেও রেহাই দেবেন না ।

মাংনিহত্যাতু রামোঽসাবচিরাৎ ত্বাং বধিষ্যতি ।
অনেন কৃতকৃত্যোঽস্মি ম্রিয়ে চাপ্যরিণা হতঃ । (৪১।১৭)

যাহোক তারপর মায়ামৃগ দর্শন ও ওটিকে ধরবার জন্য সীতার আব্দার এবং লক্ষ্মণকে সীতার প্রহরায় রেখে রামের মায়ামৃগানুসরণ।

এখানে কন্দলী রামায়ণে আছে এই শ্লোকটি —

কর্মণা বাধ্যতে বুদ্ধির্ন বুদ্ধ্যা কর্ম বাধ্যতে ।
সুবুদ্ধিরপি রামোঽয়ং হৈমং হরিণমন্বগাৎ ।। (অরণ্য কাণ্ড)

কিন্তু বাল্মীকিতে নেই ।

তারপর মূল ও অনুবাদের কাহিনী মোটামুটি ঐক্য আছে । মারীচের লক্ষ্মণের নাম ধরে আর্তনাদ, সীতার বিহ্বলতা, লক্ষ্মণের প্রতি অশ্রাব্য কটূক্তি, লক্ষ্মণর রামের নিকট গমন, রাবণের আত্মপ্রকাশ, সীতার সঙ্গে বাদানুবাদ, সীতাহরণ, জটায়ুর বাধা ও পক্ষচ্ছেদ, পর্বতশৃঙ্গে পাঁচটি বানরের কাছে সীতার বস্ত্রাভরণ নিক্ষেপ ইত্যাদির অনুবাদ মোটামুটি মূলানুগ । রাবণ লংকাতে রাবণকে এনে প্রলোভন ও ভয় দেখিয়ে বশীভূত করার চেষ্টা করলেন, সীতার দীপ্ত ও কর্কশ উত্তরে ক্রুদ্ধ রাবণ অশোক বনে পরিবেষ্টিত করে সীতাকে রাখলেন । এর আগে আটজন রাক্ষসকে দণ্ডকবনে রামলক্ষ্মণের প্রতি নজর রাখতে পাঠিয়েছিলেন রাবণ ।

কন্দলী একটি নতুন আখ্যান দিয়েছেন । সীতা যদি নিরাহারে প্রাণ দেয় তবে রাবণ বধ হবে না । কাজেই ব্রহ্মা অমৃত পায়স দিয়ে পাঠালেন ইন্দ্রকে । ইন্দ্র বললেন —

ভুঞ্জিয়োে পায়স শোক করা পরিহার ।
শত বরষিতো ক্ষুধা ন লাগিবে আর ।। (৩২১৪)

এ কি রাক্ষসের মায়া ? বললেন - সীতা

তুমি যেবে ইন্দ্র মই জান কেনমত । (৩২১৬)
শুনি ইন্দ্রে ধরিলন্ত আপোন স্বভাব ।
জাজ্বল্য সমান তুমি - নোচোলয় পাব ।।
চক্ষুত নিমিষ নাহি দিব্য বস্ত্র গায়ে
হাতে বজ্র ধরি স্থিত অন্তরীক্ষ ভাগে । (৩২১৭)

তখন সীতা পায়স নিয়ে

> রাম লক্ষ্মণক লাগি দুই ভাগ বটাইলা।
> এক ভাগ পরমানু আপুনিয়ো খাইলা ॥ (৩২১১)

ওদিকে লক্ষ্মণের সঙ্গে রামের সাক্ষাৎ হল। তখন মারীচের মায়া বুঝেছেন রাম। সীতাকে না দেখে ব্যাকুল হলেন রামচন্দ্র। অরণ্যকাণ্ডের ৫৭ অধ্যায় থেকে ৬৬ অধ্যায় পর্যন্ত বিরহব্যাকুল রামচন্দ্রের প্রেমোন্মত্ত চরিত্র – গম্ভীর ও করুণ আবেগে অপূর্ব কাব্যরস মণ্ডিত। তার তুলনায় কন্দলীর রামচন্দ্রের বিলাপ একেবারে সাদামাটা। তারপর জটায়ুকে দেখে সীতাহত্যাকারী বলে ক্রোধ পরে রাবণ সীতাকে হরণ করেছে এই সংবাদ শোনা, জটায়ুর মৃত্যু, অগ্নি সংস্কারও পিতৃসখার জন্য রামচন্দ্রের তর্পণাদি ক্রিয়া সম্পাদন মূলানুগ।

বাল্মীকি লিখেছেন –

> রোহিমাংসানি চোৎকৃত্য পেশী কৃত্বা মহাযশাঃ।
> শকুনায় দদৌ রামো রম্যে হরিত শাদ্বলে ॥ (৭৮।৩৩)

কন্দলীর অনুবাদ –

> দুই ভাই দিলা পাছে পিণ্ড জলাঞ্জলি।
> রোমাছে দিলন্ত চটকর কাকবলি ॥ (৬৩৫৩)

রাম পশ্চিমদিকে চললেন। ক্রৌঞ্চবনে আয়োমুখী রাক্ষসীর কথা বলেছেন বাল্মীকি যে লক্ষ্মণকে বিবাহ করতে আসে, এবং খড়্গাঘাতে লক্ষ্মণ তার নাসিকাকর্ণ ছেদন করেন। এই কাহিনীটি বাদ দিয়েছেন কন্দলী। তারপর আরও গভীর বনে কবন্ধের সাক্ষাৎ। কবন্ধ আসলে দনু গন্ধর্ব অভিশপ্ত ছিলেন, রামের হস্তে মৃত্যু বরণ করে শাপমুক্ত দনু দিব্যদেহ পেলেন এবং রামকে পম্পা সরোবরের দিকে যেতে বললেন। সেখানে মতঙ্গ আশ্রমে শবরীর সঙ্গে দেখা করলেন এবং শবরী দেহত্যাগ করলেন। মূলানুগ কাহিনী। পম্পা, কন্দলীর ভাষায় চম্পা সরোবর হয়েছে। তার সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন বাল্মীকি। পম্পা সরোবরের দৃশ্য মনোরম। চম্পা (পম্পা) সরোবরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে কন্দলীতে –

স্থলপদ্ম জলপদ্ম দেখি জাতিস্কার ।
সেয়ালী নেবালী পুষ্প দেখিলা অপার ॥ (৩৩৮২)

তারপর তাঁরা কবন্ধের নির্দেশ মতো ঋষ্যমূক পর্বত দেখতে গেলেন ।

নানা সব মৃগ পক্ষী দেখিলান্ত তথা ।
পাঁচগুটি বানর বসিয়া আছে তথা ॥
এতেকে অরণ্যকান্ড হল সমাপতি ।
মাধবে ভণন্ত মহামানীয়ে শুনন্তি ॥ (৩৩৮৪)

বাল্মীকির অরণ্যকান্ড ৭৫ সর্গে সম্পূর্ণ কন্দলীর শ্লোকসংখ্যা সাকুল্যে ৭৭৩, পদ ৬৯১, দুলড়ি ৪২, ছবি ১৪, ঝুমুটি - ৪২ ।

কিষ্কিন্ধ্যা কান্ড

কিষ্কিন্ধ্যা কান্ডের প্রথমেই কন্দলী ঋষ্যমূক পর্বতে সুগ্রীব সমাগম বিষয় উল্লেখ করেছেন । বাল্মীকি ধারার সংক্ষেপ অনুসরণ । পর্বতের নিম্নে দুইজন অস্ত্রধারীকে দেখে বালীর চর বলে সন্দেহ হয় সুগ্রীবের । হনুমান ছদ্মবেশে এলেন পরিচয় নিতে ।

বাল্মীকি লিখেছেন – "ভিক্ষুরূপং ততো ভেজে শঠবুদ্ধিতয়া কপিঃ (৩।২) । কন্দলীর উক্তি –

তেতিক্ষণে হনুমন্তে রাজার আদেশে ॥
রাম লক্ষ্মণত পাচে ব্রাহ্মণর বেশে ॥ (৬৪০০)

লক্ষ্মণ নিজেদের পরিচয়, সীতাহরণের কথা এবং সুগ্রীব রাজার সঙ্গে পরিচয়ের জন্য কবন্ধের বাক্যে আগমন – এই কথা বললে হনুমান নিজেকে সুগ্রীবের মন্ত্রী বলে পরিচয় দিলেন এবং কপিরূপ গ্রহণ করে তাঁদেরকে সুগ্রীবের কাছে নিয়ে পরিচয় করালেন । তারপর "অগনিক প্রদক্ষিণ দুয়ো করিলন্ত" (৬৪১৫) । অগ্নি সাক্ষ্য করে মিত্রতা করলেন তাঁরা । সুগ্রীব বললেন –

সত্য করি বুলিলোহো শুনিয়োক মিতা ।
ত্রিভুবন বিচারিয়া আনি দিব সীতা ।। (৩৪১৮)

সীতার পরিত্যক্ত অলংকার দেখালেন সুগ্রীব রামকে । রাম তা হাতে নিয়ে বুকে চেপে ধরে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন । তারপর সুগ্রীব নিজের ভ্রাতার সঙ্গে বিরোধের ইতিহাস শোনালেন । দুন্দুভি বধের পর তার ছেলে মায়াবন্তের (মায়াবীর) সঙ্গে যুদ্ধ । বালী তাকে অনুসরণ করে গুহামধ্যে গেলেন — 'পঞ্চদশ মাস' (বাল্মীকি মতে এক বছর "সংবৎসরো গত:" - ৯।১৫) । পরে গুহামুখে রক্ত দেখে এবং বালী প্রত্যাবর্তন না করলে, তাঁকে মৃত বিবেচনা করে গুহামুখে পাথর চাপা দিয়ে রাজধানীতে ফিরে আসেন সুগ্রীব এবং অমাত্যদের অনুরোধে রাজ্য গ্রহণ করেন । এরপর একদিন বালী ফিরে এসে তাঁর কোন কৈফিয়ৎ না শুনে এক বস্ত্রে তাড়িয়ে দিয়েছে এবং পত্নীকে-ও হরণ করেছে ।

"তেনাহমপবিদ্ধশ্চ হৃতদারশ্চ রাঘব ।।" (১০।২৭)

আমি স্ত্রীহরণে দু:খিত (ভার্যাহরণ দু:খিত: - ১০।২৮) হয়ে ঋষ্যমূক পর্বতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আছি ।

সুগ্রীব-ও যে ভ্রাতৃবধূ তারাকে গ্রহণ করেছিলেন বাল্মীকির সুগ্রীব রামকে প্রথম বিবরণ দেবার সময় এ কথা উল্লেখ করেন নি, তাঁর স্ত্রী রুমাকে বালী হরণ করেছেন, এটাই বলেছেন । রামের স্ত্রী-ও রাবণ কর্তৃক অপহৃতা আর সুগ্রীবের স্ত্রী-ও সবলে বালী কর্তৃক গৃহীতা । এতে স্বভাবতই বালীর প্রতি রামের প্রচণ্ড ক্রোধ ও সুগ্রীবের প্রতি সহানুভূতি হবে । মহাকবি বাল্মীকি এইভাবেই মনস্তত্ত্ব সম্মত উপায়ে উপস্থাপিত করেছিলেন । কন্দলী কিন্তু এ তাৎপর্য অনুধাবন করেন নি । তিনি বালীর মুখে অভিযোগ করেছেন —

ভয়ংকর শিলাগোট দুয়ারত দিয়া ।
সুখে রাজ্য করে ভ্রাতৃবধূ সম্ভরিয়া ।। (৩৪৮৭)

তারপর অবশ্য নিজে ভার্যাহরণের বিবরণ-ও দিয়েছেন —

দেশর ডাকিলে একখানি বস্ত্র দিয়া ।
রাজ্য ভোগ করে মোর ভার্য্যা সম্ভরিয়া ।। (৬৪৮৯)

তারপর মতঙ্গের অভিশাপে বালীর ঋষ্যমূক পর্বতে গমনে বাধার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে এবং বালীর বিক্রম জানাবার জন্য দুন্দুভি বধের বিবরণ । রাম কি পারবেন এ হেন বালীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে ? রাম বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে দুন্দুভির অস্থিসঞ্চরণে আঘাত করলেন "বৃদ্ধ অঙ্গুলিয়ে তাক আচারি পেলাইল" (৩৪১৬) এবং তা "পরিলেক শত যোজনর গৈয়া পথ" (৩৪১৭) । দ্বিতীয় পরীক্ষা সপ্ততাল ভেদ । বালী তিনটি ভেদ করত এক শরে — "তিনি গাছ ভেদো দদা এক শর ঘায়ে (৩৪১১) । রাম — "এক প্রহারতে ভেদিলেন্ত সাত গাছ ।" (৩৫০৩)

তারপর বালীবধের কাহিনী মোটামুটি মূলানুগত । প্রথমবার সুগ্রীবের শোচনীয় পরাজয়, পরে মাল্য চিহ্নিত সুগ্রীবকে চিনতে পেরে বালীবধ । কয়েকটি জায়গায় ব্যতিক্রম বা বৈশিষ্ট্য আছে । বালী-সুগ্রীব দ্বন্দ্বে উভয়ের দেবপিতৃ যুগলের, ইন্দ্র ও সূর্যের — উত্তেজনার বর্ণনা আছে —

সূর্যের লগত দেব যতক আছয় ।
সুগ্রীব জিনন্ত বুলি করে জয় জয় ।। (৩৫২৮)
বাসবর লগে দেব আছে যত যত ।
বালী জিনন্তোক বুলি বঞ্চয় মনত ।। (৩৫২৯)

দ্বিতীয়বার যখন সুগ্রীব এসে বালীকে যুদ্ধে আহ্বান করেন তখন তারা বালীকে যুদ্ধে যেতে বারণ করেছিল । একটা যুক্তি ছিল সুগ্রীবের পক্ষে রাম আছে । বালী বলেছিলেন - রাম ধর্মজ্ঞ পারিবারিক কলহে কেন পক্ষ নেবেন ? বাল্মীকির তারা কিছু বলেন নি, কিন্তু কন্দলীর তারার জবাব —

তথাপি বালিকে তারা বুঝাই বুলিলন্ত ।
ভকতর পদে রামে অন্যায় করন্ত ।।
ভকত বৎসল গুণ এতেকে রামর ।
সুগ্রীব ভকতি তাপন্তে করে নিরন্তর ।। (৩৫১৫)

কন্দলীর তারা দুঃস্বপ্ন দেখেছিলেন, দুর্লক্ষণ দেখেছিলেন –

ডাহিনর চক্ষু মোর সঘনে সঘনে ফুরে
আরু হৃদয়েতে ভালে শুনা । (৩৫৮৮)

বাল্মীকির তারা কেবল বিলাপ-ই করেছিলেন বালীর মৃত্যুতে, কিন্তু কন্দলীর তারা বিলাপ ছাড়া-ও রামকে পতিব্রতা শাপে দগ্ধ করেছিলেন –

বাহুর প্রতাপে তুমি সীতাক লভিবা ।
অগণিত পরীক্ষিয়া অযোধ্যাক নিবা । (৩৬৬৬)
*** *** ***
মই যেন মরোঁ হেরা স্বামীর বিয়োগে ।
তোমাক বঞ্চিব সীতা দেবীর সম্ভোগে ॥
বিচ্ছেদ লগাইয়া হৃদয়ত দিয়া শাল ।
করিবা কাতর তভো যাইবন্ত পাতাল ॥ (৩৬৬৭)

– একেবারে অমোঘ ভবিষ্যতের ঘোষণা ।

বাল্মীকির অনুপম নিসর্গ কাব্য – প্রস্রবন গিরি, বর্ষা ও শরৎ বর্ণনা – কন্দলীর রচনায় অনুপস্থিত ।

তারপর সুগ্রীবের প্রতি লক্ষ্মণের ভর্ৎসনা ও সুগ্রীবের সীতা সন্ধানের তৎপরতা মোটামুটি এক প্রকার । সুগ্রীব যে কোটি কোটি নানা জাতীয় বানর ও ভল্লুক সৈন্য সমাবেশ করেছিলেন, সংখ্যার দিক দিয়ে একটু ইতর-বিশেষ থাকলেও যূথপতির নামের তালিকা – শতবলী, সুষেণ, তার অঙ্গদ, পদ্ম, শঙ্খ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, কেশরী, তার, হনুমন্ত, জাম্বুবন্ত, নল, গবাক্ষ, গন্ধমাদন, দধিমুখ আদি বাল্মীকি ও কন্দলীতে এক । তারপর পূর্ব, উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে চারদিকে সীতা অন্বেষণের জন্য চার দল বানর পাঠিয়ে দিলেন সুগ্রীব । পূর্বের দিকে নেতা বিনোদক (বিনত), পশ্চিমে সুষেণ, উত্তরে সাতবলী আর দক্ষিণে অঙ্গদ তার সঙ্গে হনুমান প্রমুখ ৭।৮ জন । কিছু অমিল থাকলেও মোটামুটি মিল আছে । রামের হাতের

অঙ্গুরী-নিদর্শন হনুমানকে দিলেন রাম। প্রতি দিকের পথের বিস্তৃত পরিচয় ও ভৌগোলিক সংস্থান বিবৃত। অঙ্গদ এক অসুর বিনাশ স্বয়ং প্রভাব গুহার কাহিনী, সম্পাতির সাক্ষাৎ। পরে সুপার্শ্বের নিকট রাবণের কথা শ্রবণ। সমুদ্রতীরে সাগর লংঘনের পরামর্শ।

বাল্মীকিতে কিষ্কিন্ধ্যা কান্ড ৬৭ সর্গে বর্ণিত। এবং কন্দলী বর্ণনা করেছেন ৫০৮ পদ, ৪২ দুলড়ি, ৩৮টি ছবি, ১৫ ঝুমুরী সাকুল্যে ৬০৩টি শ্লোকে।

সুন্দরা কান্ড

কে সমুদ্র লংঘন করে লংকায় যেতে সক্ষম তার পরামর্শ হল। সকলের সামর্থ্য বর্ণনা ও বিচার। শেষে জাম্বুবান হনুমানের নাম বল্লেন এই প্রসঙ্গে। তার জন্ম ও বাল্যবৃত্তান্ত বর্ণনা করেন। কেশরী বানরের স্ত্রী অঞ্জনার গর্ভে পবন দেবতার তেজে হনুমানের জন্মলাভ করেই রাঙা প্রভাত সূর্যকে ফল মনে করে ধরবার জন্য লম্ফ দিয়ে সূর্যের প্রচন্ড তাপে পর্বত শিখরে পড়ে গেল শিশু হনুমান —

> শিখরে পরিয়া ভাগি গৈল হনুবাম।
> সিকারণে ভৈল হনুমন্ত হেন নাম॥ (৪৩২৭)

এই কাহিনীটি বাল্মীকি বর্ণনা করেছেন কিষ্কিন্ধ্যা কান্ডের ৬৬ সর্গে। সেখানে আছে সূর্যতেজেও ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গিয়েছিল শিশু বানরটি, বাম হনু ভেঙে গিয়েছিল। পুত্রের এই অবস্থা দেখে বায়ু ক্রুদ্ধ হলে ব্রহ্মা বর দিলেন যে হনুমান অস্ত্রদ্বারা অবধ্য হবে, আর ইন্দ্র বর দিলেন — হনুমানের হবে ইচ্ছা মৃত্যু। এই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ কথা কন্দলী উল্লেখ করেন নি। পক্ষান্তরে হনুমানের মুখে তাঁর পিতা কেশরীর বীরত্বের নতুন কাহিনী দিয়েছেন। কীভাবে তার পিতা কেশরী প্রভাসতীর্থে শঙ্খ ধবল নামে দিগ্‌গজকে বধ করে ভরদ্বাজাদি ঋষির স্নানকার্য অবাধ করেছিলেন, ফলে বর লাভ করেছিল যে তার পুত্র হবে গরুড়ের মত শক্তিশালী ও বায়ুর মত বেগবান।

সবে ঋষি মিলিয়া বাপক দিলা বর ।
পুত্রেক হৈবেক গরুড়র সমসর ॥
বীরগণিতাত গণিবেক সাতো আগে ।
গরুড়র বায়ুর সদৃশ হৈব বেগে ॥ (৪০৩৫-৩৬)

অতঃপর মহেন্দ্র পর্বতের চূড়ায় উঠে সকলের আশীর্বাদ নিয়ে রামলক্ষ্মণ সুগ্রীবকে স্মরণ করে – বিরাট শরীর প্রকাশ করে লাফ দিল হনুমান । হনুমানের শক্তি-বুদ্ধি পরীক্ষার জন্য "নাগর মাতা" সুরসাকে নির্দেশ দিলেন দেবগণ । সুরসা ক্রমে হনুমানের দেহবৃদ্ধির অনুপাতে শতযোজন পর্যন্ত মুখব্যাদন করল এবং হনুমন্ত মুহূর্ত কালের মধ্যে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ দেহ ধারণ করে মুখের মধ্যে ঢুকেই বাহির হয়ে গেলেন । সুরসা খুশী হয়ে আশীর্বাদ করলেন –

অব্যাহত হয়ে সীতার বার্তাক
রামত আসি জনায়ো ॥ (৪০৫৮)

তারপর সমুদ্রগর্ভ থেকে উঠে মৈনাক পর্বত-ও নিজের শৃঙ্গে খানিকটা বিশ্রাম নিয়ে যেতে অনুরোধ করল । মিত্রতা হল দুজনের । কিন্তু বিশ্রামের অবকাশ কোথায় ? বুড়ো আঙুল স্পর্শ মাত্র করে ছুটলেন হনুমান ।

হনুমন্তে পরশিল বৃদ্ধ যে অঙ্গুষ্ঠে ॥
হনুমন্তে রাম কার্যে আকুলিত হুয়া ।
ছুটিল নরাচ যেন নিকলিল গৈয়া ॥ (৪০৬১)

বাল্মীকি কিন্তু অঙ্গুষ্ঠ নয় হস্তদ্বারা স্পর্শের কথা বলেছিলেন (ইত্যুক্ত্বা পাণিনা শৈল-মালভ্য হরি পুঙ্গব – ১।১২৭) কন্দলীর মন মূলতঃ ভক্তিরসাপ্লুত – তাই হস্তের স্থলে বৃদ্ধঙ্গুষ্ঠ হয়েছে । বর্ণনায় ক্রম বিপর্যয় আছে । বাল্মীকি আগে মৈনাক পরে সুরসা বর্ণনা করেছেন । তারপর সিংহিকার কথা । কন্দলী নামোল্লেখ করেন নি – 'ছায়াগ্রাহী নিশাচরী' বলেছেন । বর্ণনা মূলানুসারী । হনুমান –

গর্ভত পশিয়া বারে করি মহা কোপ ।
নাড়ীচন ছিরিয়া গলত দিলা সোপ ॥ (৪০৭৬)

লংকা দর্শন করলেন হনুমান বহু প্রাসাদ পুকুর পাদবাদি শোভিত । বাল্মীকি "সরলায় কর্ণিকারংশ্চ" (২।১) ইত্যাদি এবং 'উদ্যানানি চ রম্যানি দদর্শ কপিকুঞ্জর:" (২।১৩) পর্যন্ত পাঁচটি শ্লোকে লংকার শোভা বর্ণনা করেছেন । কর্ণিকার খর্জুর, প্রিয়াল, জম্বীর কুটক, কেতক, প্রিয়ঙ্গু, নীপ, সপ্তপর্ণ, আসন, কোবিদার, করবীর — এই নামগুলি দিয়েছেন বাল্মীকি । কৃত্তিবাসের বর্ণনা —

সরল পিয়াল খর নিখর খর্জুর ।
শাল, তাল, তমাল গুবাকি বীজপুর ।।
অশ্বত্থ কপিত্থ, বট, নারঙ্গ, বদর ।
তেন্তেলি কণ্টাদি আম জাম নাগেশ্বর ।।
খাজুরি হরিতা আম লম্বি ডহা ফল ।
চুতিয়াল গুয়া নারিকেল যে শ্রীফল ।।
সলঙ্কা মহরি আরু কমলা টেঙ্গয়া ।
কর্দে পিচুমর্দক যে সোলঙ্কা অঙ্কুরা ।।
কদম্ব গুলাল পারিজাতক অবশেষ
সেবতী মালতী গুটিমালী যে বিশেষ ।। (৪০৮৭-৮৯)

লংকা প্রবেশের মুখে বাল্মীকির বর্ণনায় লংকার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সঙ্গে হনুমানের মোকাবিলা হয়েছিল কিন্তু কৃত্তিবাস এ প্রসঙ্গ বাদ দিয়েছেন । বাল্মীকি লংকা নগরী রাবণাদির বাসগৃহ উপবন, সৈন্য, নাগরিক, নগরী, শস্যাগার, পুষ্পক বিমানাদি — সবকিছুর বিস্ময়কর সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়েছেন ষষ্ঠ থেকে একাদশ সর্গ পর্যন্ত বিস্তৃতভাবে । রাবণের ঐশ্বর্য, শক্তি প্রভাব, রুচিবোধ সম্বন্ধে কাব্যপূর্ণ বর্ণনা । কৃত্তিবাস ৩৪টি পদ, ১৩টি ছবি, মোট ৪৭টি শ্লোকে লংকার সৌন্দর্য সাধারণভাবে বলেছেন । রাবণের প্রভাব কত — তা দেখাতে তিনি বলেছেন —

একেখানে আছে সাপে নেউলে ছাগে বাঘে ।
মূষকে চাচরি করে বিড়ালর আগে ।।
ঘোটকে মহিষে সিংহে গজে এক ঠায়ে ।
কাকো কেহো ন মানয় রাবণ প্রভাবে ।। (৪১২০)

সত্ত্বগুণাশ্রিত তপোবনের প্রভাব গুণটি যে বেমানান রজস্তমো গুণের আধার রাবণের লংকায় – এই দিকটি খেয়াল করেন নি। রাবণের শয্যায় মন্দোদরীকে দেখে সীতা মনে করে বিস্মিত হয়েছিলেন পরে বুঝেছিলেন –

ঘামবর বল্লভা জানন্ত ধর্মাধর্ম।
প্রাণ যাইতেও ন করিয়াছেন কর্ম।।
শুনিয়াছো রাজার প্রিয়া পটেশ্বরী।
ময়দানবর জীউ এহি মন্দোদরী।। (১৪৫০-৫১)

তারপর অশোকবনে সীতার দর্শন পেলেন হনুমান। প্রভাতে রাবণের সঙ্গে সীতার সংলাপ, রাবণের প্রলোভন ও ভয় প্রদর্শন এবং সীতার তিরস্কার ও তেজের বর্ণনা মূলানুগ। দুই মাসের সময় দিলেন রাবণ সীতাকে – "দ্বৌমাসৌ রক্ষিতব্যৌ" (২২।৮) "মাসা দুইক লাগি দিলো মই দিনঅবধি" (৪২১৬)। চেরীদের অত্যাচার ত্রিজটার স্বপ্ন, হনুমান সীতা সংবাদ, রামের অঙ্গুরী ইত্যাদি কাহিনীর ধারা প্রায় একই রকম। বাল্মীকি বলেছেন রাবণের সঙ্গে যে সব রাণীরা এসেছিলেন ধান্যমালিনী রাবণকে ফিরিয়ে নেন। কন্দলী মন্দোদরীর কথা ও নলকুবেরের অভিশাপের কথা বলেছেন। ত্রিজটার স্বপ্ন ১

সীতা-হনুমান সংবাদ মূলানুগ বর্ণনা। হনুমান সীতাকে অশোকবন থেকে নিয়ে চলে যেতে চাইলে সীতা অস্বীকার করে বলেছিলেন –

ইঠাত্তর পরা কি কার্যক নিবে মোকে।
রাঘবর বল বীর্য হাসিবেক লোকে।।
সর্বজনে বুলিবে বান্দরে মুত হরি।
জিনি নিবে নোয়ারিল আপোনার নারী।। (৪৩২৪)

সীতার মণি প্রদান ইত্যাদি।

অশোক বণভঙ্গ, সেনাপতি সহ জম্বুমালী, অক্ষকুমার বধ ইত্যাদি ঘটনার পর ইন্দ্রজিত কর্তৃক ব্রহ্মাস্ত্রে হনুমানের বন্ধন। ব্রহ্মাস্ত্রে বন্ধন সম্বন্ধে কন্দলী নতুন কথা বলেছেন। ইন্দ্রজিত নাগপাশে দিয়ে হনুমানকে বন্দী করতে না পারায় অভিমানে চলে যান ব্রহ্মার

কাছে । ব্রহ্মা বলেন যে গুরু স্মরণ না করে বানমোচন ব্যর্থ হয় ।

গুরু সে পরম বন্ধু গুরু আদি দেব ।
গুরু বিনে ত্রিজগতে আন নাহি কেব ।।
গুরুক সুমরি যেবে করল সন্ধান ।
হানিবয় তেবেসে ব্রহ্মার নাগবাণ ।। (৪৪৫২-৫৩)

বন্দী হনুমানকে দেখে বিস্মিত রাবণ তার পরিচয় জানতে চাইলেন - হনুমান নিজের নাম ও সত্য পরিচয় দিয়ে রাবণকে পরামর্শ দিলেন সীতাকে ফিরিয়ে দিতে —

অবধ্য দুর্জয় বীর রাম হেন জানি ।
মাথে তুলি সীতাদেবী সমর্পিয়ো আনি ।।
আমার বচনে শীঘ্র করিও প্রবন্ধ ।
তেবেসে জানিবা নিশ্চে রক্ষা পরে কন্ধ । (৪৪৮০)

ক্রুদ্ধ রাবণ প্রাণদন্ডের আদেশ দিলেন । কিন্তু বিভীষণ বললেন দূত অবধ্য । কাজেই লেজে কাপড় জড়িয়ে আগুন দেওয়া হোক হুকুম হল । লেজে কাপড় জড়ানো নিয়ে কন্দলী মৌলিকতা দেখিয়েছেন । রাক্ষসরা যত কাপড় জড়ায় - তত বড় হয় হনুমানের লেজ । ভান্ডারী রাবণকে বলল — আর বস্ত্র নেই । তখন —

রাজা বোলে ভণ্ডারী বানর বলীয়ার ।
বস্ত্র কাটি আন গৈয়া জানকী সীতার ।। (৪৫০৫)

এই কথা শুনে হনুমান লেজ সংকোচন করলো । তারপর আগুন লাগানো হল । চেরীরা গিয়ে এ খবর দিল সীতাকে । সীতা ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা জানালেন — হে অগ্নিদেব আমি যদি পতিব্রতা হই তবে তোমার তাপ যেন হনুমানের অঙ্গে শীতল হয় । কন্দলী লিখেছেন, সীতা সরমার মুখে এই খবর শুনে সীতা প্রার্থনা জানালেন —

প্রণামো অগনিদেব বায়ু তুমু সখা ।
হনুমন্ত পুত্র মোর পুত্রবতে রাখা ।।
যেবে সই লজোনোহো শ্রীরামত পরে ।
শীতল হুয়োক হনুমন্তর শরীরে ।। (৪৫১৪)

মনের আনন্দে লংকা দগ্ধ করলেন হনুমান । তারপর সমুদ্রের জলে অগ্নি নির্বাপণ করলেন । কিন্তু কন্দলী বলেছেন অন্য কথা –

আকাশের বাণী বীরে শুনিলা তহিত ।
মুখে চুচ্চি অগণিক পেলায়ো তুরিত ।। (৪৫৩৪)

লংকাদহনে আনন্দিত মারুতি হঠাৎ উদ্বিগ্ন হলেন সীতামাতা-ও ভস্মীভূত হন নি তো ? অশোকবনে ছুটে গেলেন হনুমান । সীতা তাকে একরাত্র বিশ্রাম করে যেতে বললেন । হনুমান রাজী হলেন না । তখন –

সীতাদেবী যাত্রা দিল সর্ব সুকুশল ।
রক্ষা বার্তি বুলি লন্ত অব্যাহত চল ।।
দেবীর নয়নে জল পরিবার দেখি ।
মারুতির ক্রন্দন লরিল হকহাটি ।। (৪৫৪৬)

তারপর হনুমানের প্রত্যাবর্তন । সংবাদ শুনে আনন্দিত বানরবাহিনী কিষ্কিন্ধ্যা গিয়ে দধিমুখ সুরক্ষিত মধুবন লন্ডভন্ড করল । নালিশ জানাতে গেল দধিমুখ । হনুমান সব বৃত্তান্ত দিলেন । সীতার মণি অভিজ্ঞান পেয়ে আনন্দে অস্থির হলেন রাম । বার বার সীতার কথা জানতে চাইলেন । হনুমান সীতার বাক্য জানালেন –

প্রভুর আগত কহিবি সকলে ।
যেন দুখ আছো বৃক্ষ শিংশপা তলে ।
রাক্ষসিনী লোকে মোক পরাভব করে ।
আমাক দন্ডিবে এহি মাসেক অন্তরে ।। (৪৬৬৮)

*** *** ***

নাসন্তে যে যেন্দে তথাপি তো নিজ স্বামী ।
আত্মঘাত করিতেয়ে মরিবাহো আমি ।। (৪৬৬৯)

বাল্মীকি এইখানে সুন্দরা কান্ড শেষ করেছেন কিন্তু কৃত্তিবাস আরো খানিকটা — রামচন্দ্রের সমুদ্রতীরে গমন বিভীষণের আগমন পর্যন্ত — অর্থাৎ যুদ্ধকান্ডে উনিশ সর্গের ঘটনাবলী সুন্দরকান্ডে বিবৃত করেছেন ।

রাম সসৈন্যে যাত্রা করলেন । রাম বললেন — আজ উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্র কাল হস্তা নক্ষত্রে চন্দ্রের যোগ হবে — এটি শুভ মুহূর্ত, কৃত্তিবাসের অনুবাদ এই প্রকার —

কালি যে উত্তর ফালগুনী নক্ষত্রে
আজি হুয়া আছে হস্তা ।
দুয়ো যে নক্ষত্রে সুমঙ্গল কহে
তারা দুই সুপ্রশস্তা ।। (৪৬৮৬)

সমুদ্রের তীরে গেলেন তাঁরা ।

লংকায়ও রাবণের মন্ত্রণা সভা বসেছে, কৃত্তিবাসে অতিরিক্ত আছে রাবণ-জননী নৈকষীর কথা । পুত্র বিভীষণের কাছে দুঃখ করলেন রাবণ সম্বন্ধে নৈকষী—

অধর্মত রাতি ভৈল সিটো দুরাচার ।
পতিব্রতা কন্যা হরিলেক পরদার ।।
ব্রাহ্মণ কুলর বেটা ভৈলে অধোগামী ।
পেটত পরিল চূর পুরি মারো আমি ।। (৪৭১০)
* * * * * * * * *
তুমিসি আছা হা বাপকুল নিস্তারণ
রাবণে রামত যেন পশয় শরণ ।।
সীতা সমর্পিবাক বুলিবা রাজনয় ।
মোর বচনক বেটা কাণে নু শুনয় ।। (৪৭১৯)

মায়ের কথা শুনে বিভীষণ রাবণকে বলেছিলেন সীতা প্রত্যর্পণ করতে । কৃত্তিবাসের রাবণের উক্তি প্রচ্ছন্ন বৈরী ভক্তের মতো—

জানো মই সীতা লক্ষ্মী জনক কুমারী ।
আর জানো রাম মধুসূদন মুরারি ॥
রামর হাতত জানো মোর মারিব জীব ।
তথাপি নি দিবো সীতা জনকর জীব ॥ (৪৭২৪)

মূল রামায়ণে রাবণের পরামর্শ সভায় প্রহস্ত, বজ্রদংষ্ট্র, মহাপার্শ্ব প্রমুখ সেনাপতিরা রাবণের সীতাহরণ ও সমর্থন করে যুদ্ধের উৎসাহ দিয়েছিল । কুম্ভকর্ণ রাবণকে নিন্দা করেছিলেন । কিন্তু পক্ষে যুদ্ধ করবার কথা-ও দিয়েছিলেন । সভা হয়েছিল দুদিন । প্রথম দিনে বিভীষণ যুক্তিসহ সাম্যনীতি অর্থাৎ সীতাকে ফিরিয়ে দিয়ে সন্ধির কথা বলে উপহাসিত হয়েছিলেন । দ্বিতীয় দিনে আবার সীতা প্রত্যর্পণের কথা বলায় রাবণ ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে বিভীষণকে বিতাড়িত করেন ।

কিন্তু কন্দলী পদাঘাতের কথা বলেছেন —

রাবণ রাজারে পাচে   লবর দিলেক ভিরি
যেন ক্রোধে ময়মত্ত হাতী ।
বিভীষণ বীরর যে   হৃদয় সাজত লৈয়া
ক্রোধে মারিলেক এক লাথি ॥ (৪৭৬৭)

বিভীষণ মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন । পরে গেলেন মা নৈকষীর কাছে এবং তাঁর পরামর্শে কুবের দাদার কাছে গেলেন । একটু নতুন কাহিনী । বিভীষণ গেলেন কৈলাসে । শিব আর কুবের পাশা খেলছিলেন । দুজনকে প্রণাম করে সব কথা জানালেন বিভীষণ । শিব বললেন — 'লংকাপুরি আইলা রাঘব শ্রীহরি'। (৪৭৮৫) কাজেই চারজন অসুরকে নিয়ে বিভীষণ রামের কাছে গেলেন, ভগবানের শরণ নিলেন ।

বাল্মীকির ধারায়-ই পরবর্তী ঘটনাসমূহ বলেছেন কন্দলী । বিভীষণকে আশ্রয় ও বিশ্বাস করা নিয়ে রাম শিবিরে মতানৈক্য । শেষে হনুমানের পরামর্শে রাম বিভীষণকে মিত্র হিসাবে গ্রহণ করলেন — এবং লংকার সিংহাসনে তখনই — 'করো বিভীষণক লংকাত অভিষেক ।' (৪৮০৮)

তারপর সমুদ্র পার হবার মন্ত্রণা । বিভীষণ সাগরের উপাসনার কথা বললেন এবং সেই মতো রাম কুশাসনে তিনদিন প্রার্থনা করলেন । কাজ হল না । তখন সমুদ্র শাসন করবার জন্য ধনুর্বাণ তুলতেই সমুদ্রদেব নলকে দিয়ে সমুদ্র বন্ধনের পরামর্শ দিলেন । সমুদ্র বন্ধন হল ।

বাল্মীকি এসব কথা যুদ্ধকাণ্ডে ২২তম সর্গে বলেছেন । কন্দলী কিন্তু এ কাহিনী দিয়ে সুন্দরাকাণ্ডে শেষ করেছেন –

মাধব কন্দলি ভণে কৌতুকে সুন্দরাকাণ্ড
সমাপতি ভৈলা এহিখানে ॥ (৪৮৪৭)

বাল্মীকি ৬৮টি সর্গে সম্পূর্ণ করেছেন সুন্দরাকাণ্ড আর কন্দলী করেছেন ৮৫৪ শ্লোকে যার মধ্যে দুলড়ি ৬০, ছবি ৩৭, ঝুমরি ৩ এবং পদ ২৫৪ টি ।

লংকাকাণ্ড

সসৈন্যে লংকা অবরোধ করেছেন রামচন্দ্র । শুক সারণকে রাবণ আদেশ দিলেন গোপনে রামের শিবিরে গিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করতে । বিভীষণের চোখে রাক্ষসের মায়া ধরা পড়ে গেল । বন্দী শুক সারণকে নিয়ে আসা হল রামের কাছে । তিনি তাঁদের মুক্তি দিয়ে, রাবণকে এই বার্তা দিলেন –

আমার ঘরিণী হরি নিল নিশাচরে ।
দশ শির ছেদিবো দুর্ঘোর দশ শরে ॥' (৪৮৬৬)

রাবণ খবর শুনে পর্বতে চড়ে রামের প্রধান সেনাপতি দেরকে দেখাতে বললেন শুক সারণকে । তার সাহায্যে নীল, অঙ্গদ, কুমুদ, জাম্ববন্ত, সুগ্রীব হনুমান প্রভৃতি ও রাম লক্ষ্মণকে দেখলেন রাবণ । পরে শার্দুল নামক গুপ্তচরকে আবার পাঠালেন রামের শিবিরে । এবার-ও বিভীষণ ধরে ফেললেন শার্দুলকে এবং রামের দয়ায় ফিরে এসে রাবণকে জানালো যে সুক সারণের বিবরণ ঠিক ।

এবার সীতাকে করায়ত্ত করতে ঐন্দ্রজালিক বিদ্যুৎজিহ্বকে নির্দেশ দিলেন রাবণ –

মায়া রূপে সৃজিয়ো রামের ধনুঃশর ॥
সীতার শোকে যাইব দগধ শরীর ।
দেখ রূপে সৃজি আন রাঘবের শির ॥ (৪১২৩)

রামের ছিন্ন শির ও ধনুর্বাণ দেখে কেঁদে আকুল হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন সীতা । এমন সময়ে পাত্র এসে খবর দিল সেনাপতি প্রহস্তের জরুরী দরকার । রাবণ চলে গেলেন ।

যেতিক্ষণে রাবণ সেথান ছাড়ি গৈলা ।
তেতিক্ষণে মায়া শির অন্তর্ধান হৈলা ॥ (৪১৪৪)

তখন সরমা এসে সীতাকে রাক্ষসের মায়ার কথা বুঝালো এবং সীতাকে সান্ত্বনা দিল ।

অথ তাং জাতসন্তাপাং তেন বাক্যেন মোহিতাম্ ।
সরমাহ্লাদয়ামাস মহীং দগ্ধামিবাম্ভসা ॥ (৩৪।১)

কৃত্তিবাসের অনুবাদ আক্ষরিক ও সুন্দর –

সরমার বোলে শোক ঘুচিল সকলে ।
খরদাগা ধান যেন বরিষণে জলে ॥ (৪১৫৫)

সরমা সীতাকে বলল যে সে অদৃশ্য ভাবে সবকিছু জানতে পারে । রামের খবর-ও আনতে পারে । সীতা রাবণের খবর জানতে চাইলেন । সরমা চলে গেল । কৃত্তিবাস লিখেছেন –

সরমায়ে সীতাকে আশ্বাস অতি করি ।
অন্তরীক্ষে চলিলা চিলনী বেশ ধরি ॥ (৪১৫১)

এই চিলনীর কথা বাল্মীকি বলেন নি, কৃত্তিবাসের নিজস্ব । সরমা জানাল যে রাবণের মা সীতাকে ফিরিয়ে দিতে বলেছেন । মাতামহ মাল্যবন্ত একই উপদেশ দিয়েছেন । মাল্যবন্ত লংকায় নানা দুর্নিমিত্তের, অমঙ্গলের নিদর্শন দেখছেন । বাল্মীকির যুদ্ধকান্ড ৩৫ সর্গের ২৪ থেকে "উৎপাতান বিবিধান্"– ইত্যাদি এবং ৩৪ শ্লোক

এতান্যন্যানি দৃষ্টানি – ইত্যাদি ১১টি শ্লোক বর্ণনা করেছেন । নমুনা –

খরা গোষু প্রজায়ন্তে মূষকা নকুলেষু চ ॥
মার্জারা দ্বীপিভিঃ সার্দ্ধং শূকরা শুনকৈ সহ ।
কিন্নরা রাক্ষসৈশ্চাপি সমেয়ুর্মানুষৈঃ সহ ॥ (৩৫।২৯-৩০)

কৃত্তিবাস-ও দুর্লক্ষণের দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন –

পথে পথে শৃগালে আরবে করে ঘনে ॥
শূকর কুকুর সব ফুরে পালে পাল ।
রাক্ষস কুলের ভেলা প্রলয়র কাল ॥
গো সবে প্রসবা গর্দভের ছায় ।
নেউলর গর্ভত ইন্দুরর উদ্ভায় ।
কুকুরে বানর হোবে বিরালত বাঘ ।
হস্তি কত উট হোৱে মহিষত ছাগ । (৪১৭৫-৭৬)

ঠিক বাল্মীকি ধারা অনুসরণ করেই রাক্ষসদের সৈন্যসজ্জার কথা লিখেছেন কৃত্তিবাস – পূর্বদ্বারে প্রহস্ত, দক্ষিণে মহোদর-মহাপার্শ্ব, পশ্চিমে ইন্দ্রজিত, ও শুকসারণ উত্তরে, আর মধ্যে বিরূপাক্ষ । রাবণের সৈন্য সজ্জা জানবার জন্য পক্ষীরূপে বিভীষণের চার সহচর সব দেখে গেল ।

অনল সুনল বীর সম্পাতি প্রঘস ।
পক্ষী রূপ ধরি আইলা চারিয়ো রাক্ষস । (৪১১৩)

বাল্মীকির মতে বিভীষণের অমাত্যদের নাম অনল, পনস, সম্পাতি ও প্রমতি । শ্রীরাম-ও সৈন্য সংস্থানের নির্দেশ দিলেন – পূর্বদ্বারে নীল, দক্ষিণ দ্বারে অঙ্গদ, হনুমান পশ্চিম দ্বারে, উত্তর দ্বারে রাম নিজে, সুগ্রীবাদি মধ্যস্থানে । মূল ও অনুবাদে এমন বৈষম্য নেই । তবে বাল্মীকির রামের একটি তাৎপর্যপূর্ণ উক্তির অনুল্লেখ আছে কৃত্তিবাসের রচনায় ॥ রাম বলেছিলেন – বানরগণ - "মনুষ্য রূপ ধারণ করবে না । রাম-লক্ষ্মণ বিভীষণ ও তাঁর চার অনুচর কেবল মানবরূপে যুদ্ধ করবেন । যুদ্ধ হল ।

বাল্মীকি বলেছেন যে, এরমধ্যে সুগ্রীব রাবণকে পর্যুদস্ত করে তাঁর মুকুট হরণ করলো। রামের নির্দেশে অঙ্গদ লংকায় রাবণের সভায় গিয়ে তাকে অপমান করে ফিরে এল। অঙ্গদ অভিযানটি –

রামক প্রণাম করিয়া অঙ্গদ
আকাশ বহিয়া যান্ত।
পাত্র সমন্বিতে ওস্বারি কোলত
রাবণক দেখিলন্ত ॥ (৫১১৭)

ইত্যাদি ১৭টি দুলড়িতে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন কন্দলী। তারপর ইন্দ্রজিতের নিশাযুদ্ধে রামলক্ষ্মণ নাগপাশে বন্দী হলেন। রাবণ এই সুযোগে পুষ্পক বিমানে করে সীতাকে দেখালেন দুজনের মৃতাবস্থা। সঙ্গে ছিল ত্রিজটা। সীতা বিলাপ করতে থাকলে ত্রিজটা বুঝালেন যে রাম-লক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত হয়েছেন, মরেন নি।

কন্দলীর ত্রিজটা-ও বাল্মীকির ত্রিজটার মতো – তিনটি প্রমাণ দিয়ে সীতাকে আশ্বস্ত করেছিল। এক, রামলক্ষ্মণের দেহের উজ্জ্বলতা, দুই সীতার দেহের অবৈধব্য লক্ষণ, আর তিন - পুষ্পক বিমান বিধবা নারীকে বহন করে না।

ইদং বিমানং বৈদেহি পুষ্পকং নাম নামত:।
দিব্যং ত্বাং ধারয়েন্নেদংযদ্যেতৌ গতজীবিতৌ ॥ (৪৮।২৫)

পুষ্পক বিমানে ইটো কল্যাণক কহে।
বিধবা নারীক ইটো থানিক ন বহে ॥ (৫১৬৫)

তবে দ্বিতীয় প্রমাণ অর্থাৎ সীতার অবিধবা লক্ষণের কথাটা বাল্মীকি বলিয়েছেন সীতার নিজের মুখে আর কন্দলী তার অনুবাদ বসিয়েছেন ত্রিজটার মুখে। গরুড় এসে রামলক্ষ্মণের নাগপাশ মোচন করলেন। কার কাছে শুনে গরুড় এলেন বাল্মীকি বলেন নি, কিন্তু কন্দলী বলেছেন বায়ুদেব এসে রাঘবকে চৈতন্য করিয়ে গরুড়কে স্মরণ করতে বলেছিলেন –

বায়ুর বচনে রামে চেতন লভিয়া মনে
পক্ষীর রাজাক সুমরিল ॥ (৫৫০২)

পরের যুদ্ধবর্ণনায় বাল্মীকির সঙ্গে একটি স্থল ছাড়া কন্দলীর কোন বিশেষ অমিল দেখা যায় না। ধূম্রাক্ষ ও অকম্পন হত হয়েছিল হনুমানের হাতে আর প্রহস্তকে বধ করেছিল নীল। বজ্রদংষ্ট্রা - বাল্মীকির মতে নিহত হয়েছিল অঙ্গদের হস্তে, কন্দলী বলেন সুগ্রীবের আঘাতে। তারপর রাবণ এলেন যুদ্ধে। ঘোরতর যুদ্ধ হল, কিন্তু রামের হাতে পরাজিত হয়ে লংকায় ফিরে গেলেন রাবণ।

তারপর কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ, সীতাহরণের জন্য রাবণের প্রতি আবার কুম্ভকর্ণের তিরস্কার, যুদ্ধ গমন ও মৃত্যুবরণ — এই বর্ণনার মধ্যে অনুবাদের দ্বারা মূল ভাব ও কথা ক্ষুন্ন হয় নি। সুগ্রীবকে বন্দী করে নিয়ে যাবার চেষ্টা, পরে রামচন্দ্র কর্তৃক কুম্ভকর্ণের প্রথম দু হাত, পরে দুই পা, ছেদন এবং শেষে মুণ্ড-চ্ছেদ যথাযথ বর্ণিত।

নিকৃত্ত বাহুর্বিনিকৃত্ত পাদো বিদার্যবক্ত্রং বড়বামুখাভম্।
দুদ্রাব রামং সহসাভিগর্জন্ রাহুর্যথা চন্দ্রমিবান্তরীক্ষে॥ (৬৭।১৬২)

দুই অর্ধচন্দ্র রামে গুণত চড়াইলা।
দুই মনে পাও তার কাটিয়া পেলাইলা॥
চন্দ্রক গ্রাসিতে যেন রাহু মুখ বায়া।
চৌরাঙ্গি শরীরে রাঘবয় যায় ধায়া। (৫৫৭১-৭২)

কুম্ভকর্ণের মৃত্যুতে বিকল হলেন রাবণ। তারপর রাবণকে প্রবোধ দিয়ে যুদ্ধে গেল নরান্তক, দেবান্তক, ত্রিশিরা, মহোদর, অতিকায় তারা যথাক্রমে নিহত হন অঙ্গদ, হনুমান, হনুমান, নীল ও লক্ষ্মণের হাতে। লক্ষ্মণকে ব্রহ্মাস্ত্র দিয়ে অতিকায়কে বধ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন বায়ুদেবতা। কন্দলীর অনুবাদ যথাযথ।

তারপর দ্বিতীয়বার যুদ্ধে এলেন ইন্দ্রজিত যথাবিধি যজ্ঞ করে।

স তত্রাগ্নিং সমাস্তীর্য শরপত্রৈঃ সতোমরৈঃ।
ছাগস্য কৃষ্ণবর্ণস্য গলং জগ্রাহ জীবতঃ॥ (৭৩।২১)
রণভূমি মাজে নিয়া অগনি থাপিল।
কালিয়া ছাগল আনি টেটু ভসাস্নিল॥ (৫৯৭৪)

তারপর অগ্নিদেবাস্ত্র আশীর্বাদ নিয়ে অন্তরীক্ষ থেকে অস্ত্রাঘাত করে রামলক্ষ্মণ সহ সকল বানরসৈন্যকে আচ্ছন্ন ও অচেতন করে লংকায় চলে গেল মেঘনাদ। তারপর জাম্বুবানের নির্দেশে হনুমান হিমালয় ওষধি পর্বতে গেলেন –

মৃতসঞ্জীবনীঞ্চৈব বিশল্যকরণীমপি।
সুবর্ণ করণীঞ্চৈব সন্ধানীঞ্চ মহৌষধিম্॥ (৭৪।৩৩)

চারিয়ো ঔষধ জ্বলে দশ দিশে ছানি।
এক নাম আছে তার মৃত্যুসঞ্জীবনী॥
বিশল্যকরণী আর সন্ধান যে করি।
স্বরূপ-করণী নামে ঔষধ যে চারি॥ (৫৬১৮)

হনুমান গিয়ে ওষুধ না চিনতে পেরে পর্বতখণ্ডটি নিয়ে এলেন। ওষুধের গন্ধেই চেতনা লাভ করেন রাম লক্ষ্মণ আর বানরগণ। তারপর –

রামের আদেশ বীরে শিরে তুলি নৈলা।
পূর্বত স্থানত নিয়া পর্বতক থৈলা॥ (৫৭১৭)

চেতনা লাভ করে বানর সৈন্য লংকা আক্রমণ করল। এবার রাক্ষসদের পক্ষে যুদ্ধে এল কুম্ভকর্ণের পুত্রদ্বয় কুম্ভ ও নিকুম্ভ, মূপাক্ষ, শোণিতাক্ষ, প্রজংঘ, ও খরের পুত্র মকরাক্ষ – তারা সবাই নিহত হল যথাক্রমে সুগ্রীব, হনুমান, মৈন্দ, দ্বিবিদ, অঙ্গদ ও শ্রীরামচন্দ্রের হাতে। মূলের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল আছে। বাল্মীকি বলেছেন কম্পন রাক্ষসকে বধ করেছিল অঙ্গদ, কন্দলী নাম করেন নি বলেছেন বজ্রকণ্ঠ অঙ্গদের হস্তে নিহত হয়।

অতঃপর তৃতীয়বার যুদ্ধে এলেন ইন্দ্রজিত। প্রথমেই নূতন কৌশল নিলেন। মায়াসীতা বধ করা হল। মায়া সীতাকে ইন্দ্রজিতের রথে দেখে হনুমান বাধা দিতে গেলেন – স্ত্রী হত্যা মহাপাপ বলে সাবধান করলেন ইন্দ্রজিতকে।

ইন্দ্রজিতে বোলন্ত বানর মহাপাপ।
এইমু কারণে বহু লোকর সন্তাপ॥
একজনী মারিলে অনেক লোক জীয়ে।

হেনর বিনাশে বধ ধর্ম কেসে দিয়ে ।।
মিছাতে নিন্দস কপি সময় না জানি ।
হেন বুলি সীতাক কাটিলা খাণ্ডা হানি ।।
হা রাম গোসাই মোহোর প্রাণনাথ ।
হেন বুলি ভূমিত পরিল গৈয়া মাথ ।। (৫৮৩১-৩২)

রাম শিবিরে কান্নার রোল উঠল । রামচন্দ্র মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন । বানর সৈন্য যুদ্ধ বন্ধ করে দিল । এমন সময় বিভীষণ এসে বললেন যে ইন্দ্রজিত মায়া সীতা বধ করে সকলকে বিভ্রান্ত করছেন । রাবণ কিছুতেই সীতাকে বধ করতে দেবেন না। ইন্দ্রজিত নিকুম্ভিলা যজ্ঞ যাতে নির্বিবাদে করতে পারেন, তার জন্য এই বিভ্রান্তি সৃষ্টি — যজ্ঞ সুসম্পন্ন করতে পারলে মেঘনাদ অজেয় হবেন ।

ব্রহ্মা বরদানে যজ্ঞ করয় নিশ্চয় ।
যজ্ঞ সমাপিলে হইব ত্রৈলোক্য বিজয় ।।
ব্রহ্মা অস্ত্র আপুনি হৈবেক উপস্থিত ।
রথ যান পাইবে জগতে অবিদিত ।।
এইমতে শুনি ইন্দ্রজিত বীরবরে ।
মায়া সীতা সাজি সিটো আনিলা সমরে ।। (৫৮৫৬-৫৭)

লক্ষ্মণকে বললেন বিভীষণ —

যজ্ঞ সমাপতি করিবাক না পারোক ।
শীঘ্রে নিকুম্ভিলা বটমূলক যায়োক ।। (৫৮৭১)

তারপর বানরসৈন্য নিকুম্ভিলা যজ্ঞে বাধা দিতে ছুটে গেল — বিভীষণ লক্ষ্মণ ও হনুমানের নেতৃত্বে । বাল্মীকি ৮৫ থেকে ৯০ ছয়টি সর্গে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। কন্দলীর বিবরণ, বিশেষত: বিভীষণ-মেঘনাদ সংলাপ এই গুরুত্বপূর্ণ অংশটি ভাবের দিক থেকে কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা সার্থক হলেও মূলের তুলনায় বিশেষত বিভীষণের উক্তি নিষ্প্রভ । যেমন ইন্দ্রজিত উক্তি —

গুণবান বা পরজন: স্বজননির্গুণোঽপি বা ।
নির্গুণ: স্বজন: শ্রেয়ান্ য: পর: পর এব স ।। (৮৮।১৫)

যদি মোর পিতৃ তোর নোহে গুণবন্ত ।
অপর যতেক জনে গুণ-বখানন্ত ॥
তথাপি তোমাক হিত বোলো খুরা শুন ।
যিটো পর পর সিটো নো হয় আপুন ॥ (৫৮১৬-১৭)

বাল্মীকির বিভীষণ বারটি শ্লোকে (৮৮।১১-৩০) যে গম্ভীর যুক্তিপূর্ণ জোরালো উত্তর দিয়েছিলেন ইন্দ্রজিতকে কন্দলীতে তা দেখা যায় না । আভাস মাত্র আছে –

রাক্ষস কুলত আমি উতপতি লভিলোহো
ধর্ম ছারি জিনিলো আন ।
আপোনার কথা নিয়া আনত লগায় আনি
বোলা মোক পাপেসে প্রধান । (৫১০৬)

কিন্তু যুদ্ধ বর্ণনায় কন্দলী যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন । উৎসাহের সঙ্গে বলেছেন নতুন কথা --

পান্চ দিন পান্চ রাতি ভৈলা ঘোর রণ ।
আকাশত হরিষে নাচন্ত দেবগণ ॥ (৫১৮০)

লক্ষ্মণ ঐন্দ্রাস্ত্র দিয়ে মেঘনাদকে বধ করেন । এবং অস্ত্র প্রয়োগের সময় একটি সত্য-শপথ মন্ত্রও উচ্চারণ করেছিলেন তিনি –

ধর্মাত্মা সত্যসন্ধশ্চ রামো দাশরথির্যদি ।
পৌরুষে চাপ্রতিদ্বন্দ্বস্তদৈনং জহি রাবণিম্ ॥ (৯০।৬৯)

কন্দলীর অনুবাদ –

রামদেব হন্ত যেবে ধর্মত প্রধান ।
দেব দ্বিজ গুরু ছারি ন জানন্ত আন ॥
ভকত বৎসল সদকর্মে সদা রত ।
ভকতি করন্ত সদা হরিশংকরত ॥
তাহাক কিঙ্কর মই রামে মোর নাম ।
এহি শরে রাবণির সংহারোক মাম ॥ (৫১৮৭-৮৮)

ইন্দ্রজিত বধ হল । রাম শিবিরে উল্লাস । রামচন্দ্র –

লক্ষ্মণক কোলে ধরি মাথাত চুম্বন করি
নানাবিধ উৎসবক পাইল ॥ (৬০০১)

রাবণ শোকে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন । পরে ক্রুদ্ধ হয়ে সীতাকে বধ করবার জন্য ছুটলেন অশোক কাননের দিকে –

মায়া সীতা কাটিলেক পুত্র বীরবরে ।
স্বরূপ সীতাক কাটি পেলো যমঘরে ॥ (৬০২২)

স্ত্রীবধে বাধা দিল অরবিন্দ নামে অমাত্য । বাল্মীকি এই অমাত্যের নাম বলেন – সুপার্শ্ব । রাবণ নিবৃত্ত হয়ে যুদ্ধে গেলেন । ঘোরতর যুদ্ধে লক্ষ্মণকে শক্তিশেলে বিদ্ধ করলেন । তখন রাম এগিয়ে এলেন । যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে চলে গেলেন রাবণ । শোকে আকুল শ্রীরামকে সান্ত্বনা দিলেন বৈদ্য সুষেণ । হনুমান গিয়ে বিশল্যকরণাদি ওষুধ পর্বত সহ নিয়ে এলেন এবং লক্ষ্মণ সুষেণের চিকিৎসাতে ভাল হয়ে গেলেন । বাল্মীকি বলেন নি, কিন্তু কন্দলী হনুমানের ওষুধ আনার পথে কালনেমি ও গন্ধকালী রূপ কুম্ভীরের কাহিনী যোজনা করেছেন । শাপমুক্ত অপ্সরী গন্ধকালী তপস্বীবেশী কালনেমিকে চিনিয়ে দিল এবং কালনেমি বধ হল হনুমানের হাতে । পর্বতটি তুলে এনেছিলেন হনুমান । পরে আবার যথাস্থানে রেখে এসেছিলেন ।

তারপর রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হল রামচন্দ্রের । মাতলি ইন্দ্রের রথ আনলেন রামের জন্য । বাল্মীকির মতই কন্দলী বিস্তৃতভাবে যুদ্ধ বর্ণনা করেছেন । মাতলির পরামর্শে ব্রহ্মাস্ত্র – কন্দলীর ভাষায় ব্রহ্মদত্ত শর – নিক্ষেপ করে রাবণ বধ করলেন রাম । ব্রহ্মাস্ত্র সম্বন্ধে বর্ণনা আছে ।

রাবণ বধের পর বিভীষণ কান্নায় ভেঙে পড়লেন । মন্দোদরী ও অন্যান্য রাবণ পত্নীদের সুদীর্ঘ বিলাপ – দুই কবিই দিয়েছেন । অধার্মিক রাবণের অন্ত্যেষ্টির ঔচিত্য সম্বন্ধে উভয় কবির বিভীষণই প্রশ্ন তুলেছিলেন –

রামে বিভীষণক দিলন্ত সমিধান ।
মৃতক জনক ন করিবা হেন জ্ঞান ।

সংস্কার করিবা মিত্র তার কার্য সাধ ।
প্রাণান্তিক ভৈলে আর কিবা অপরাধ ॥ (৬৪১৮)

বিভীষণের অভিষেক হল । হনুমান গেলেন সীতার কাছে । যে রাক্ষসীরা সীতাকে যন্ত্রণা দিত, হনুমান তাদের শাস্তি দিতে চাইলে সীতা নিষেধ করলেন ।

ন পরঃ পাপমাদত্তে পরেষাং পাপকর্মণাম ।
সময়ো রক্ষিতব্যস্তু সন্তশ্চারিত্র ভূষণা ॥ (১১৩।৪২)

গোসানী বোলন্ত বাপু হনুমন্ত
ইহাক দিক টঙেকাসি ।
রাক্ষসিনী লোক স্বতন্ত্রী নোহে
সবে রাবণর দাসী ।
তাহার বচন হেলা করে যদি
ন তু চরুযায় মোক ।
তেতিক্ষণে মোক কাটিতে পারয়
ত্রৈলোক্যে নাহিকে রাম ॥ (৬৪৬৪)

তার সীতাকে আনা হল রামের কাছে । রাম কঠোর বাক্যবাণে সীতাকে প্রত্যাখ্যান করলেন ।

বিদিতশ্চাস্তু ভদ্রং তে যোহয়ং রণ পরিশ্রমঃ ।
সুতীর্ণঃ সুহৃদাং বীর্যান্ন ত্বদর্থং ময়া কৃতঃ (১১৫।১৫)

ইত্যাদি রামের সুদীর্ঘ ও কর্কশ কথাগুলির যথাযথ অনুবাদ করেছেন কন্দলী –

রাবণক মারিয়া এরাইলো লোকবাদ ।
তোমাক আনিলো রাখি বংশর মর্যাদ ॥ (৬৪৯৮)

ইত্যাদি শ্লোকে । তারপর অগ্নি পরীক্ষা, সীতাসহ অগ্নির আবির্ভাব ও প্রত্যর্পণ । দশরথের আবির্ভাব, ইন্দ্রের অমৃত সিঞ্চনে মৃত বানর ভল্লুকের জীবন লাভ ।

অমৃতর বৃষ্টি করিলেক দেবরাজ ।
শ্রীরামর হিত চিন্তি সংগ্রামর মাজ ॥

দারুণ সমর সাজে যতেক মরিল ।
নিদ্রায় জাগিয়া যেন উঠিয়া বসিল ॥ (৬৫৪৬)

তারপর পুষ্পকে আকাশ মার্গে প্রত্যাবর্তনের পথে রামচন্দ্র সীতাকে বিভিন্ন স্থান ও ঘটনার কথা বললেন এক এক করে । বাল্মীকি বলেছেন যে কিষ্কিন্ধ্যাতে সীতা অবতরণ করে বানর বধূদের সঙ্গে নিয়েছিলেন । কন্দলী তার উল্লেখ করেন নি । তবে ভরদ্বাজ আশ্রমের কথা আছে । অতঃপর ভরতমিলন, রামের রাজ্যাভিষেক, বানর রাক্ষসদের নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনের বিবরণ কন্দলীতে সংক্ষিপ্ত হলেও মূলানুগত । বাল্মীকি লংকাকাণ্ডের শেষ শ্লোকে বলেছেন –

আয়ুষ্যমারোগ্যকরং যশস্যং
সৌভ্রাতৃকং বুদ্ধিকরং শুভঞ্চ ।
শ্রোতব্যমেতন্নিয়মেন সদ্ভি
রাখ্যানমোজস্করমৃদ্ধিকামৈ: ॥ (১১৩।১২২)

কন্দলীর অন্ত্য উক্তি –

এতেক জানিয়া রামত ভক্তিয়ো
তেজিয়া সমস্ত কাম ।
সংসার সাগর সুখে হোক্তা পার
ডাকি বোলা রাম রাম । (৬৭১৮)

কন্দলীর লংকাকাণ্ডে দুলাড়ী ২৭৬টি, ছবি ১০৫টি, এবং পদ ১৪৮৯ । সাকুল্যে ১৮৭০ শ্লোক আছে ।

মাধব কন্দলীর চরিত্র চিত্রণ –

কন্দলী রামায়ণ অনুবাদ করার সময় প্রধানত: বাল্মীকির রামায়ণের গৌড়ীয় পাঠ অনুসরণ করেছেন । কিন্তু তাতে বাল্মীকির অনুসরণ করার সঙ্গে সঙ্গে স্বকীয় কল্পনাকেও আশ্রয় করেছেন । চরিত্রগুলি নিজের কল্পনা অনুযায়ী খানিকটা পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করেছেন । এখানে সেই পরিবর্তন বা পরিবর্ধন নিয়েই

আলোচনা - মূল রামায়ণে ধৃত পরিচিত চরিত্রসমূহকে মুখ্য করে নয়।

বাল্মীকির রাম রসশাস্ত্রের ধীরোদাত্ত গুণান্বিত নায়ক। কিন্তু কৃত্তিবাস ও কন্দলীর রাম বিষ্ণুর অবতার হলেও মাঝে মাঝেই সাধারণ মানুষের মত ব্যবহার করেছেন। স্মরণীয় যে আদি কবিও সীতার বিরহে শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণের শোকে মানুষের মতো ব্যবহার করেছেন, কিন্তু কন্দলীর ক্ষেত্রে স্বাদ আলাদা। এইসব ক্ষেত্রে কোনো কোনো অংশে চরিত্রের দৈবী মহিমা কিছুটা ক্ষুণ্ণ হলেও পাঠক সমাজকে পর্যাপ্ত তৃপ্তি দান করেছে। কন্দলী সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় গুণ পাঠকচিত্তের আকর্ষণকে কোনভাবেই ব্যাহত না হতে দেওয়া। সমালোচকের মতে তাঁর কাব্যে গ্রাম্যতা দোষ কোন কোন স্থানে প্রত্যক্ষ হলেও তা তার কাব্যপ্রতিভাকে ক্ষুণ্ণ করেনি - বরঞ্চ সরস ও সবল করেছে।

রামের জীবনের সবচাইতে কঠিনতম সময় বনবাসের পূর্বে পিতার হতাশার কারণ জানতে চাওয়ার সময় বাল্মীকির রাম মূলতঃ নম্র, শান্ত ও ভক্তি ব্যাকুল। কিন্তু কন্দলীর রামের আত্মশ্লাঘামূলক আস্ফালনের মাত্রাধিক্য রামের বীরত্বকে ক্ষুণ্ণ করেছে। কিন্তু তৎকালীন সমাজের এই বয়সী একটি তরুণের চরিত্র সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। এই উক্তিতে পিতার প্রতি ভক্তি হ্রাস না হলেও নিজের বীরত্ব উচ্চারিত হয়েছে। যেমন -

'ক্ষত্র বীর যতেক আছয় রবিতলে।
কেহো নোহে শকত মোহোক বাহুবলে॥ (১৬৭৫ অ.কা.)

মোহোর আগত কিছু নোহে দেবাসুর।
মুঠির প্রহারে পর্বতক করো চূর॥ (১৬৮২ অ.কা.)

তিনিয়ো ভুবনে মোক নাহি সমসর।
বাপক করিবো তিনি ভুবন ঈশ্বর॥ (১৬৬৮ অ.কা.)

এইভাবে রামের আত্মশ্লাঘা পূর্ণ উক্তিসমূহে কন্দলীর নিজস্ব মাত্রা দিয়ে সরস করেছেন। বনবাসের সংবাদে ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণকে শান্ত করার সময় কৈকেয়ীর

গুণ ব্যাখ্যা করে তাঁর এই ব্যবহারে –

দৈবে সমে যুজে কোনে কহত কাহিনী ।
কৈকেয়ীক দোষ কেন দিয়স ন জানি ॥ (১৭৫২)

ইত্যাদি বললেও সীতার কাছে বনবাসের কথা বলার সময় শেষ পর্যন্ত রামের ক্ষোভ লুকিয়ে রাখতে পারেন নি । যেমন –

পাপক সঙ্গিলে শরীর দুঃখিলে,
কৈকেয়ীয়ে কাল সর্প ।
মিলিল বিঘাত, বাক্য বিষে ছলি
হরি নৈল বলদর্প ॥ (১৬২১ অ.কা.)

বনবাসের প্রথম রাত্রিতে বাল্মীকির রাম লক্ষ্মণকে সম্বোধন করে বলেছেন যে লক্ষ্মণ সঙ্গে থাকায় তাঁর ভালই হয়েছে নয়তো বৈদেহীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাঁকে অন্য কারো সাহায্য নিতে হ'ত । প্রশান্ত ধীর রামচন্দ্র । কিন্তু এই ধৈর্য বিচলিত হয়েছিল – ভরদ্বাজাশ্রমের কাছে, জনপদের বাহিরে প্রথম রাত্রি বাসের কালে । ব্যসনের ফল, কাম ও অর্থের প্রভাব, পিতার অবিচার, কৌশল্যার জন্য উদ্বেগ, ভরতের সমৃদ্ধি ও ভাগ্য ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা খেদ ও আক্ষেপ করেছিলেন বাল্মীকির রাম । কন্দলীর রামের আবেগ তীব্রতর । অভিমানের সুর স্পষ্টতর হয়েছে –

'ভরত নৃপতি ভৈলে নথাই বুজিউলি ।
মারিবে কৈকেয়া মোর মাও বাপ পুলি ॥
এভো তই নথাই দেশক চলি যাহা ।
অনাথিতি মাওক বাপক ভালে চাহা ॥ (২০৫৪ অ.কা.)

ভরতের সৌভাগ্য সম্বন্ধে এই ঈর্ষার আভাস রামচরিত্রকে মনুষ্য চরিত্রের কাছাকাছি এনেছে – এবং 'বাবা-মা'র নিরাপত্তার জন্য লক্ষ্মণকে পাঠাবার প্রস্তাব আশঙ্কাতুর হৃদয়ের প্রতিফলন । সন্দেহ কিন্তু কৈকেয়ীর প্রতি ভরতের প্রতি নয় ।

রামায়ণে কেন্দ্রীয় চরিত্র রামচন্দ্র। তাঁকে ঘিরেই কাহিনী ও অন্যান্য চরিত্রের বিকাশ। ঈশ্বর অবতার রূপে গৃহীত হলেও মানুষের জীবনধারা — শোক-দুঃখ, বেদনা-আনন্দ, যাবতীয় দোষ গুণ - তাঁর চরিত্রে আভাসিত ও সমন্বিত। কৈকেয়ীর লোভ ও নিষ্ঠুরতার জন্যই তিনি রাজ্যচ্যুত, পিতার মৃত্যু ও অযোধ্যার রাজপরিবারের বিপর্যয় — এই কথা রাম ভুলতে পারেন নি। নির্বাসনের প্রাক্‌কালে 'দৈব' বলে লক্ষ্মণকে বুঝাতে, হয়ত নিজের মনকেও শান্ত করতে, যে কথা বলেছেন — তা যে তাঁর অন্তরের একান্ত কথা ছিল না — তা বুঝা যায় অযোধ্যার বাহিরে প্রথম রাত্রে লক্ষ্মণের কাছে মর্মবেদনা প্রকাশে। আবার বিরাধের হাতে পুতুলের মতো অসহায় সীতাকে দেখেও তাঁর মনে পড়েছে — কৈকেয়ীর নিষ্ঠুরতার কথা —

প্রাণ তেজোঁ কৈকেয়ী পুরোক মনোরথ।
আবে অবিকলে রাজ্য করোক ভরত॥
কৌশল্যা জননী পিতৃ অযোধ্যার পতি।
দুই হন্তো কৈকয়ীত করিলো ভকতি॥
তথাপি তো নৃপুরিন পাপিষ্ঠার মন।
মাবিপ্রাক লাগি মোক পাঠাইলেক বন॥ (২৭০০)

এই জাতীয় ক্ষোভ ও অভিযোগের কথা — বার বার বলেছেন রাম যখনই কোন গভীর ক্ষোভের কারণ হয়েছে, যেমন মায়াসীতা বধে, লক্ষ্মণ [illegible] ইত্যাদিতে। কিন্তু এ থেকে বিমাতার প্রতি এই মর্মের গভীরে বিরূপতা ও ঘৃণা থেকে মনকে পরিষ্কারের চেষ্টাও করেছেন। তার চরম অবস্থাটি দেখা যায় লঙ্কা-কাণ্ডে। দশরথ কোনদিন কৈকেয়ীকে ক্ষমা করতে পারেন নি - আর পিতার এই গভীর মর্মবেদনা রামের অন্তরের গভীরে প্রোথিত। তাই সীতার অগ্নিপরীক্ষার পর যখন দশরথ আবির্ভূত হয়ে সকলকে আশীর্বাদ করলেন, তখন শ্রীরাম শেষ প্রার্থনাটি করে-ছিলেন পিতার কাছে, দশরথ যেন কৈকেয়ীর অপরাধ মার্জনা করেন —

রাঘবে বোলন্ত বাপ বচন ন বাধো।
এখানি গোচর তয়ু চরণত সাধো॥

বুলিলা পাপিষ্ঠী আর ন চাহিবো তোক ।
কৈকেয়ী মায়র দোষ সব দিয়া মোক ॥
তোমার মনত যদি হৈনয় সন্তোষ ।
সমস্ত এরিলো কৈকেয়ীর যত দোষ ॥ (৬৫৪১-৪২)

রামচরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যটি বাল্মীকিও উল্লেখ করেছেন তবে কন্দলীর ক্ষেত্রে আরো আবেগপূর্ণ ।

কন্দলীর কলমে রামচরিত্রের আর একটি মৌলিক দিক চিত্রিত হয়েছে — বনবাসাজ্ঞা প্রাপ্ত রামচন্দ্রের সীতা-সম্ভাষণের প্রাক্মুহূর্তে । রূপমুগ্ধ, কাম-চঞ্চল তরুণের মনে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে যাবার আশঙ্কা বেদনায় যে ভাব-ভাবনা জাগে — তেমনি ভেবেছেন রাম । সর্বাঙ্গ সুন্দরী সীতার বর্ণনা —

মুখচন্দ্র ভরি অমৃতর অভিলাষে ।
গ্রাসিবাক লাগি রাহু আসিভৈলা পাশে ॥ (১৮২৮)

ইত্যাদি আটটি পদে দীর্ঘ বর্ণনা অত্যন্ত বেমানান । বাল্মীকি বলেন নি । এই অতি স্থূল নাগর-মানসিকতা রামচরিত্র মহিমা ক্ষুণ্ণ করেছে । পক্ষান্তরে সীতাবিরহী-রামের যে প্রেমোন্মাদনা অরণ্য-কিষ্কিন্ধ্যা-সুন্দরা কান্ডে বাল্মীকি রচনা করেছেন এবং কন্দলী সার্থক অনুরণন করেছেন তা স্থূল যৌনতা মুক্ত প্রেমরস । সুগ্রীবের কাছে সীতার পরিত্যক্ত অলংকার পেয়ে —

হা প্রাণেশ্বরী বলি কান্দি মূর্ছা গৈলা ।
ভূমিত পরিয়া প্রভু অচেতন ভৈলা ॥ (৩৪২৮)

একান্ত মানবিক উত্তেজনায় ভরা । আর একটি চিত্র - হনুমান সীতার অভিজ্ঞান মণিরত্ন দিয়েছেন রামকে । রামের অবস্থা ও আস্বাদন —

আছিলে মরিলো শোকে হৃদয় নধরে ।
তপত খোলাত দিলে যেন মৎস্য মরে ॥
মানিক দেখিয়া আগে হরিষ মিলিল ।
সীতাক সুমরি আরো অগনি জ্বলিল ॥ (৪৬৬৩)

একান্ত মানবিক। ততোধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও প্রেমরসে সমৃদ্ধ - রামচন্দ্রের হৃদয়ের গভীর আকুতি ও ব্যাকুলতা কন্দলীর ভাষায় অনবদ্য রূপ পেয়েছে।

হনুমন্ত মোহোক পিঠিত করি লোয়া।
সীতার পাশত নিয়া এতিক্ষণে থোয়া॥
চন্দ্রবদনী দেখো চক্ষু মোর ভরি।
আনিক্ষিয়া থাকোহো লাজক পরিহরি॥ (৪৬৬৪)

রামচরিত্রের বিচিত্র ও বহুমুখিতার মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ – বালীবধ, ভরত সম্বন্ধে ধারণা ও সীতার প্রতি আচরণ। বাল্মীকি যেভাবে এই বিতর্কিত বিষয় ও ব্যবহারসমূহ বিশ্লেষণ করেছেন – কন্দলীও তার অনুসরণ করেছেন বিশ্বস্ত ভাবে। কিন্তু বাল্মীকির রচনাতে রামের লোক-অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির যে গাম্ভীর্য আছে, কন্দলীতে তা পাওয়া যায় না। প্রত্যাবর্তনের পথে ভরদ্বাজাশ্রমে রাম হনুমানকে পাঠিয়ে দিলেন ভরতের কাছে। বলেছিলেন রামের প্রত্যাবর্তনের কথা শুনে ভরতের মনের ভাব কি, মুখে তার প্রকাশ কেমন - তা যেন হনুমান লক্ষ্য করেন। কারণ মানুষ কোন বিশেষ অধিকার ভোগ করলে তার চিত্তবিকার হতে পারে। এই সূক্ষ্ম নির্দেশ কন্দলীর রাম দেন নি হনুমানকে – কেবল বলেছেন –

পাছে তুমি নন্দিগ্রাম নগরীক যাইয়া।
ভরতর আগে সব কুশল জানাইবা॥ (৬৫৮১)

দশরথ, কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সীতা, লক্ষ্মণ ভরতাদির চরিত্র মোটামুটি বাল্মীকির আদলে রচিত। কৈকেয়ীর রূপমুগ্ধ বৃদ্ধ দশরথের সত্য-শৃংখলে বন্ধন ও তারজন্য আমরণ গ্লানি ও অপরাধ বোধ, কৌশল্যার ধৈর্য, কৈকেয়ীর সপত্নী ঈর্ষা, লোভ ও নিষ্ঠুরতা; সীতার রামৈকপ্রাণতা, রামের প্রাণ-*ইনস্পিরে* লক্ষ্মণের জীবনের "অনু-ব্যঞ্জনের মত" অপরিহার্য ভ্রাতৃভক্তির বিগ্রহ ও অপরাজেয় পৌরুষের আধার লক্ষ্মণের ধর্মের দিকে রামচন্দ্রের থেকেও মহত্তর। ("রামাদপি হিতং মন্যে ধর্মতো বলবত্তরম্") ভ্রাতৃভক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ – স্বাদুতম 'পলান্নের মত '' ভরতের এবং হনুমান বালী, সুগ্রীব, রাবণ-বিভীষণাদির চরিত্রের যে রূপরেখা বাল্মীকি রচনা করেছেন,

কন্দলী তারই অনুসরণ করেছেন। তবে রাবণচরিত্র সমকালের ভক্তিভাবের আলোকে প্রচ্ছন্ন ভক্তের আভাসে কখনো বা নতুন রঙের ছটায় আলোকিত।

তবে কিছু কিছু ছোট চরিত্রে কন্দলী নতুন রং দিয়েছেন। যেমন মন্থরা বা কুজার চরিত্র। কুঁজা যে রামের অভিষেকের বিরুদ্ধে কৈকেয়ীকে বুদ্ধি দিয়েছিল, ভরতকে রাজা করতে চেয়েছিল — সেটা তার বুদ্ধি মতো কৈকেয়ীর — তার স্বামিনীর মঙ্গলের জন্যই। কিন্তু কন্দলী তাতে একটি এমন মাত্রা দিয়েছেন, যাতে কৌতুক রস এবং তার সঙ্গে খানিকটা ভ্রষ্টাচার ও কুরুচির আভাস আছে। ভরত ফিরছেন শুনে কুজা নানা অলংকার ভূষণে সজ্জিত হয়ে চলল কৈকেয়ীর ঘরে —

মই বান্ধো রূপবর হেনয় সো হয়।
মোহের স্বরূপে দেখো আমানো জুলয়।
বয়সত বর মই ভরতত করি।
কামবশ ভৈলো মিটো দোষক ন ধরি॥
বিদিতে কুমারে যেবে নাজে কিছু করি।
গুপ্ত রূপে তথাপি তো হৈবো পটেশ্বরী॥ (২২৮৭-৮৮)

কন্দলী রামায়ণে সমকালীন সমাজ :

মানুষ সামাজিক জীব। সমকালের ভাব-ভাবনা, ব্যবস্থা-আদর্শ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-সংস্কার সবকিছুই মানুষের অন্তরে অবচেতনে অবস্থিত। কবিরাও এই চেতনার অধীন। অনুবাদ করবার কালেও কাহিনীর উপস্থাপনে, বর্ণনায় চরিত্র চিত্রণে উপজীব্য গ্রন্থের বাহিরে এসে অনুবাদক কবি সমকালের ভাবনার রসে লেখনী অভিসিঞ্চিত করে নেন। ফলে তাঁর রচনার খুঁটিনাটি দেখে বিশ্লেষণ করে কবির স্থান কাল সম্বন্ধে বিপরীত ক্রমে অবহিত হওয়া যায়।

কন্দলীর রামায়ণেও তার স্বাক্ষর পরিষ্কার। রামকে বিষ্ণুর অবতার বলে স্বীকৃতি কিছুটা অস্ফুট হলেও বাল্মীকি স্থানে স্থানে দিয়েছেন। কন্দলীতে সেটা অধিকতর পরিস্ফুট। বিষ্ণুপূজার কথা বাল্মীকিতে আছে। কন্দলীতে তার

সঙ্গে মিশেছে শিবার্চনার রং। বৈকুণ্ঠের সঙ্গে কৈলাসের কথাও এসেছে। সমকালে শৈব-শাক্ত ধর্মের প্রভাব আসামে পর্যাপ্ত ছিল। নানাদিক থেকে এই ভাবকল্পনা ক্রিয়াশীল।

রামের প্রাসাদকে বাল্মীকি বলেছেন ইন্দ্রাবাস সদৃশ। কন্দলীর ভাষায় —

রামের প্রাসাদ শোভে কৈলাস সমান।
বিদ্যুতর কান্তি যেন জ্বলে থানে থান ॥ (১৬৪১)

প্রাসাদের স্থাপত্য ও অলঙ্করণে - শিবপার্বতীর চিত্র, কার্তিক গণেশের চিত্রাদিও আছে —

শঙ্করক লেখিল আছন্ত বৃষস্থানে।
পার্বতীক লেখি আছে সিংহর বাহনে ॥ (১৬৪৬))

সমকালে নাথ যোগীদের প্রভাবও ছিল পূর্বাঞ্চলে। কন্দলী তারও চিত্র দিয়েছেন রামের বনগমন কালে অনুসরণকারীদের মধ্যে

যোগীর কান্ধত কান্দিজুলি যত
হাতে দোয়াদশ কাষ্ঠি।
নগরন্তে নগরন্তে পাকে চান্তে
হিয়া মানে গৈল ফাটি ॥ (১১৬০)

হর-পার্বতীর দাম্পত্য আদর্শ সর্বকালে স্বীকৃত হলে, স্থান কাল বিশেষ তার উল্লেখাধিক্য বিশেষ সময়ের নির্দেশক :

তুমি সমে চিত্রকূটে হৈল্লো আমি স্থিত।
গৌরী মহাদেবে যেন কৈলাস গিরিত ॥ (২০৮৮)

শাক্ত আচারের নিদর্শন —

আমি ভৈলো কৈকেয়ীর অষ্টমীর ছাগ।

মনসা বা গারুড়ী বিদ্যার কথাও আছে। রামের কথায় লক্ষ্মণ কিরকম শান্ত হলেন

যেহেন সর্পর বিষ শিখাগ্রহে গৈল।
লক্ষাই আনি গারুড়ী নিষ্প্রভ হৈল ॥ (১৭৬৬)

রামায়ণ-কাহিনীর বর্ণনাভূমি ও পরিবেশ বন-নদী-পর্বতাদি প্রধান। কেবল অযোধ্যা কাণ্ডে ও লঙ্কাকাণ্ডে দশরথের ও রাবণের পুর ছাড়া নাগরিক জীবনের বর্ণনা নাই। কন্দলীর রামায়ণে সামাজিক নানা বর্ণনা বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীশঙ্করদেবের বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের পর আসামে জাতিভেদ প্রায় নাই বললেই হয়। গোত্র ও বৃত্তিগত জাতিভেদ আসামে নেই। তবে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব এখনও প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু মাধব কন্দলীর রামায়ণে বৃত্তিগত জাতির বর্ণনা রয়েছে।

ক্ষত্রী বৈশ্যগণ, কায়স্থ সজ্জন
নট ভাট তেলী তান্তী।
ঠঠারি সোনারি কঁমার সেখারী
ভরতর লগে যান্তী॥
বনিয়া চামার কমার সূতার
ধোবা আরু কুম্ভকার॥ (২০৮২)

এই কাহিনী ভরতের সঙ্গে রামকে বন থেকে ফিরিয়ে নেবার আয়োজনে ছিল। আবার রাম বনবাস গমনকালে তার সঙ্গে যাওয়া লোগীর কথা আগেই বলা হয়েছে। তাছাড়াও—

পুস্তক কান্ধত ধরিয়া পাচত,
চলিলা ব্রাহ্মণ যানে।
নট ভাট আদি কিঙ্কর নক্ষিল,
আছিল যতক মানে। (১১৬৩)

আসামের কয়েকটি শিল্প ভারতবিখ্যাত বস্ত্র, বেত, বাঁশ ও কাঁসা। এই সমাজের বর্ণনা থেকে আসামের কাঁসা শিল্পের প্রাচীনত্ব ও নিরূপিত হয়। আসামের কাঁসা শিল্পের একটি সর্বভারতীয় মূল্য আছে। আর রামায়ণে 'কঁমার' শব্দ তৎকালীন সমাজে এ শিল্পের প্রচলনের ইঙ্গিত করে। তেমনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে কন্দলী তান্তী কথাটি মাত্র উল্লেখ করেছেন।

রাম বন গমন কালে অনুসরণকারী প্রজাগণ রামের কৌশলে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। কিন্তু রামের বিরহে সবাই নিজ কর্ম ত্যাগ করে। সেই বর্ণনায় বর্ণগত কর্মের পরিচয় আছে,

দেয়রীয়ে দেব পূজা করিলে বিচ্ছেদ।
ব্রাহ্মণ সকলে নপঢ়য় আরো বেদ ॥
ক্ষত্রে এরিলেক অস্ত্র শস্ত্র কর্ম্ম।
বৈশ্যে এরিলেক কৃষি বাণিজ্যের কর্ম্ম ॥
শূদ্রে এরিলেক সেবা বিষাদিত লোক।
পুত্রে, মাতৃ এরিলে তেজিলে স্বামী লোক ॥
সকলে প্রজাক ভৈল অসুখ আকৃতি।
ছত্রিশ জাতিয়ে তেজিলেক নিজ বৃত্তি ॥ (২০০৫-৭)

উপমামূলক প্রবাদ বাক্যের মধ্যেও বৃত্তি বিপর্যয়ের মাধ্যমে সমাজ পরিচয় সূত্র পাওয়া যায় —

বিপ্রের কপিলা যেন চন্ডালের ঠায়ে। (৪১২০)

হাড়ী জাতি হয়া পরিবাক চাসে বেদ। (৩১৭৬)

এই বৃত্তিগত সমাজ পরিচয় ছাড়াও উপমা অলঙ্কার ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যে সমাজের আভাস আমরা পাই তা প্রধানত: কৃষিভিত্তিক। বিভিন্ন চিত্রকল্প এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

১. হিয়া মাটি পাইল যেন কুর লাঙ্গলর।
২. বোঝার উপর যেন শাক পর্বন্তর।
৩. ধান্যক পীড়িয়া বিনে বনে থাকে জুরি।
৪. থর লাগা ধান যেন বরিষন জলে।
৫. মুখে দিলে ধান আথে হেয়ে যেন হেমনি বন্ধে নিশ্বাস।
৬. কোন বংশে হোবস্ পতান যেন তুষ।
৭. বিচি ধান রুইলো যেন উখরা ভূমিত।
৮. মান্ডে ধান খাইলে তাতির কাটে বাটি।

৯. নির্গত প্রাণীর নাহি বৈত ভাত কণ্ঠ ।

১০. মেরুর সমান চরাষ্ট্র করিল ধরিকা জহার পিঠা ।

কৃষি প্রধান দেশ আসামের কথার সঙ্গে সঙ্গে কৃষির প্রধান শত্রু পঙ্গপালের উল্লেখও কন্দলীর রামায়ণে পাওয়া যায় । এই পঙ্গপালের কথায় মনে হয় কন্দলীর সময়ে অথবা অদূর অতীতে আসামে পঙ্গপালের আক্রমণ হয়েছিল । সুগ্রীবের আদেশে বানর সৈন্য সমাবেশের বর্ণনায় আছে —

১. 'আসিলেক সৈন্যগণ দশো দিশ ছানি ।।'
আকাশ ছানিয়া যেন ফরিঙ্গ উজান্ত । (৩৭৫৬)

২. যেহেন ফরিঙ্গ উড়ে বানর আকাশে । (৩৭৮১)

কন্দলীর রামায়ণে 'নট' শব্দের ব্যবহারে তৎকালীন সমাজে নৃত্যগীত-জীবী সম্প্রদায়ের স্থিতির সূচনা করে । তবে এরা সমাজে অন্ত্যজ ছিল তার আভাস পাওয়া যায় সীতার উক্তিতে —

'আমাক ইতরনারী সম দেখিলাহা ।
নটর নটিনী যেন আনক বিলাহা ।।' (৬৫০৮)

এই ইতর শব্দের ব্যবহারে বোঝা যায় নটিনী বহুভোগ্যা ছিল ।

নটের উপস্থিতিতে নৃত্যগীতাদির প্রচলন আর বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখে এই বিদ্যার সমাদর বোঝা যায় ।

বীরঢাক ঢোল বাজে তবল ডগরা দস্তি
শব্দ শুনিয় কোলাহল ।
ভেমচ ফেমচ চয়, ঝাঝর রেমচি বাজে
রাম তাল আরু করতাল ।।
টোকারি বেন্দরা রুদ্র বিপঞ্চিঃ দোতরা বাজে
বীণা বাঁশি দোশরী মোহরী ।
ডিডির কাহালি শিঙ্গা ভেরী ডাকে নিরন্তর
পূর্ণ ভুবনকো গৈলা পুরি ।। (৩৬১৪)

এর মধ্যে কিছু বাদ্যযন্ত্র আজও বহুল প্রচলিত ও জনপ্রিয় ।

নৃত্য গীত বাদ্যের সঙ্গে অন্য একটি জনপ্রিয় বিষয় খেলা । প্রাচীন কাল থেকেই মনোরঞ্জনের এক পন্থা খেলা । কন্দলী সেই খেলাকেও অবহেলা করেন নি । তাঁর কাব্যে খেলার পরিবেশ না থাকলেও তিনি এর বর্ণনার অবকাশ খুঁজে পেয়েছেন সুন্দরা কান্ডে ; যখন হনুমান সীতার অন্বেষণে লঙ্কাপুরী ভ্রমণ করছে সেই সময়ে । লঙ্কার বর্ণনার সঙ্গে রাক্ষসদের বিভিন্ন খেলার যে বর্ণনা তা একান্তই মাধব কন্দলীর নিজস্ব ।

'কৌতূহলে খেলাব্য় সুবর্ণর ঘিলা ।।
ভন্টা খেড়ি খেলাব্য় কতো খৈলে ঝুন্টি ।
ঠায়ে ঠায়ে ক্রীড়া করে আকুটি ভ্রূকুটি ।।
ছয়াল মেলেক্ক সবে করে হাতাহাতি ।
মাল বান্ধে যুজয় দেখিতে ভাল আতি ।।
ঢোপ খেড়ি খেলাব্য় কতো নুনি নুনি ।
গুবাল গুয়ালা খেলে আনন্দিত শুনি ।।
ফল ফুল টোকরা আবর জুয়া পাশ ।
দলি যুজে খেলে কতো নব্রি হতাশ ।।   (৪০০৬ - [illegible])

সমাজে প্রচলিত আনুষ্ঠানিক রীতিনীতি সম্বন্ধেও কন্দলী বর্ণনা করেছেন । বিবাহের পর রামাদির প্রত্যাবর্তনে তাঁদের বরণের উল্লেখ অযোধ্যা কান্ডে পাওয়া যায় । স্ত্রী আচারের মাধ্যমে অশুভ নাশ হওয়ার উল্লেখ আছে । অধিবাসের পর যজ্ঞের প্রথাও ছিল, তা ছাড়া যাত্রা কালে মঙ্গলামঙ্গল, অঙ্গকম্পন, কাক চরিত্র, কথন ও স্বপ্ন ফল ইত্যাদির প্রভাব ও সংস্কার সে সময়ে সমাজে প্রচলিত ছিল ।

১.   থাপিলন্ত গৃহত সুবর্ণময় ঘট ।
কন্যাসবে পারিল বাটত নেত পট ।।
আপোনার আচার করিল নারীগণে ।

২.	আশীর্ব্বাদ দিয়োক মায়্ করিয়া আঘ্রাণ ।
সীতা সমন্বিতে মোর আজি অধিবাস ।।
মাঙ্গল্য দিয়োক মায়্ স্ত্রীর আচার ।
বিঘিনি বিনাশ হৌক সীতার আমার ।।	(১৫৫৫-৫১)

৩.	শুক্লা চামর ফল পুষ্প দধি ক্ষীর ।
সুবর্ণর ঘটত সাত সাগরের নীর ।।
গঙ্গা যমুনাক আদি যত তীর্থজল ।
শ্বেত ছত্র জ্বলে যেন চন্দ্রের মন্ডল ।।
সুবর্ণ কুম্ভত সুগন্ধিত ভরি জল ।
সুবর্ণ পতাকাধ্বজ রচিল চিত্রল ।।	(১৬৩১-৩২)

৪.	বেদমন্ত্রে অগণিতে আহুতি করিল ।।
আহুতির শেষে রাম আনন্দিত মনে ।
দেব্ ঘরে থাকিলন্ত কুশর শয়নে ।।

গ্রহ নক্ষত্রের শুভাশুভ প্রভাব, স্বপ্ন দর্শনের মঙ্গলামঙ্গল আর যাত্রাপথের শুভাশুভ দর্শনের বিশ্বাস বাল্মীকির কাল হতে আজ পর্যন্ত মাত্রা ভেদে প্রচলিত । রামকে যুবরাজ করার সময় দশরথ দুঃস্বপ্নের উল্লেখ করেছেন যার ফল গ্রহণ দুর্বিপাক এবং মৃত্যু ।

১.	স্বপ্নেক দেখিয়া বিচলিত মোর চিত ।
ভূমিকম্পে নির্ঘাত পরিল পৃথিবীত ।।
দুই গ্রহ মন্দ মোর রাহুয়ে মঙ্গলে ।
দৈবজ্ঞে গণিয়া মোত কহিল সকলে ।।	(১৫৪৭)

ভরত মাতুলগৃহে দুঃস্বপ্ন দেখে পিতা দশরথের অমঙ্গল আশঙ্কা করেছেন ।

পিঙ্গল বরণী নারী একজনী
আলিঙ্গি আসি ধরিল ।
ইসব স্বপ্নের ফলে নিরন্তর
কহয় বাপর কাল ॥ (২২২৪)

আবার বালী যুদ্ধ যাত্রা করার সময় তারার দুঃস্বপ্ন ও ডান চোখ স্পন্দিত হচ্ছে ।

স্বপনর কথাকহো শুনিয়োক প্রভু তযু
হৃদয়ত লাগি গেলা যাটি ।
উপরোক হইয়া পোড় তোমার শরীর গোট
সমূল পশ্চিল যাটি ফাটি ॥ (১৫৮৪)

ডাহিনর চক্ষু মোর সঘনে সঘনে ফুরে ।
আক হৃদয়ত ভালে শূনা । (১৫৫৮)

এই অনুরোধ রক্ষা না করে বালী যুদ্ধ যাত্রা করলে বিভিন্ন অমঙ্গলসূচক চিহ্ন দেখতে পান ।

মাথার উপরে কাক শগুণ বর্ণায় ॥
বাম পাশে সর্প যায় ডাহিনে শৃগাল ।
কাক গৃধ পাখীর আকাশে কোলাহল ॥
চন্ডবায়ু বহে ঘোলা থাপরর জাক ।
কিষ্কিন্ধ্যাত বুধিরে বরিষে জাকে জাক ।
হাস্তং কেঁচি নমানিয়া রণক গমন । (১৫১৭-১১)

রাবণের প্রতি মাল্যবানের উক্তিটিও উল্লেখযোগ্য,

লঙ্কাতে অনিষ্ট ভৈলা তোমার কারণে ।
পথে পথে শৃগালে তোরাব করে মনে ॥
শূকর কুকুর সব ফুরে পালে পালে ।
রাক্ষস কুলর ভৈলা প্রলয়র কাল ॥
গো সবে প্রসবয়ে গর্দভর ছাগ্ন ।

নেউলর গর্ভত ইন্দুরর উদ্ভার ।।
কুকুরে বানর হোবে বিরালী বাঘ ।
ইরিকত উট হোবে মহিষত ছাগ ।।
সুপনর নারী সব দিগম্বর বেশ ।
রাক্ষস সবক খাইলা মুক্ত করি কেশ ।।
মেঘ সবে বরিষয় পর্বত শিখরে ।
কাক সবে বিনাচয় লঙ্কার উপরে ।।
ঠায়ে ঠায়ে দেখিয়া পুরুষ মুণ্ড লুণ্ডা ।
হস্তী মুণ্ডা দীর্ঘ তুণ্ডা খুখুণ্ডা চামুণ্ডা ।। (৪১৭৫-৪১৭৮)

মৃতদেহ অগ্নিসংস্কার করার বিবরণ আছে দশরথ, বালী ও রাবণের মৃতদেহ সৎকারের বর্ণনায় । মৃতদেহ চতুর্দোলায় তুলে আত্মীয় স্বজন সেই দোলা কাঁধে শ্মশানে যাওয়ার রীতি ছিল । দশরথের চিতায় উরুখল ও মুষল স্থাপনের কথা পাওয়া যায় । পশু বধ করে হোম করার ও সবৎসা ধেনু দানের পর মুখাগ্নি করার বর্ণনা পাওয়া যায় ।

দশরথের মৃত্যুর পর ভরত ও শত্রুঘ্ন দশদিন অশৌচ পালন করে একাদশ ও দ্বাদশ দিনে শ্রাদ্ধ করেন ।

একাদশা দোরা দশা শ্রাদ্ধ নিরন্তিন ।
নানাবিধ দান পাছে ব্রাহ্মণক দিল ।।
হাতী ঘোড়া রথ যত চতুর্দ্দোলা যান ।
দাসী দাস রূপা সোনা গৃহ বস্ত্রদান ।।
তাম্বুল ভোজন মাল্য আরো বর বস্ত্র ।
শয্যা ধেনু বৃষভ দিলন্ত বর ছত্র ।। (২০৪৭-৪৮)

এই দানের বর্ণনা যথার্থই একজন রাজার, এই শ্রাদ্ধ সহস্রোপচারের । আবার বনবাসী রাম লক্ষ্মণ যে [redacted] পিণ্ড দ্বারা শ্রাদ্ধ সাঙ্গ করেছেন তা যথার্থই বনবাসীর উপযোগী ।

ইঙ্গুদীর দ্রব আম জাম আদি ফল ।
এক থান করিলন্ত মন্দাকিনী জল ।।
নদীজলে বুর দিয়া অঞ্জলি করিল ।
ইঙ্গুদীর দ্রব আম জাম আদি দিল ।।
একথান করিলন্ত মন্দাকিনী জল ।
কুশ পারি ভূমির উপরে পিন্ড দিল ।।
হেরা পিন্ড লোয়া বনে যে হেন মিলিল ।। (২৫৪৩)

আবার বালীর মৃত্যুর পর অঙ্গদ যে শ্রাদ্ধ করেছেন তা বৃষোৎসর্গ ।

দন্ত কাষ্ঠ কাক বলি আর স্নান বলি ।
অঙ্গদে পিতৃর দিলা পিন্ড জলাঞ্জলি ।।
নিজ গুরু ব্রাহ্মণে দিবন্ত স্নাহি পাহি ।
অঙ্গদে করিলা কর্ম বিধিবতে চাহি ।।
নানাবিধ দান করিলন্ত বৃষোৎসর্গ ।
হনুমন্ত সুগ্রীব্ সমস্তে জাতি বর্গ ।।
দানে মানে সব জ্ঞাতি লোক তুষ্ট ভৈলা । (৩৬১৭-১৮)

এই তিন শ্রাদ্ধের বর্ণনা থেকে এটুকু অনুমান করা যায় যে তৎকালীন সমাজে সামর্থ অনুযায়ী সবাই পারলৌকিক কার্য্য সমাধা করতেন ।

সমাজের সঙ্গে সঙ্গে রাজসভার কথাও এসে পড়ে । কারণ সমাজ মথিত উৎকৃষ্ট ব্যক্তিসমূহই রাজসভার শোভা বর্দ্ধন করেন । কন্দলীর পৃষ্ঠপোষক রাজার রাজসভা পন্ডিত বহুল ছিল এর প্রমাণ কন্দলীর এই উক্তি —

পন্ডিত লোকর যেবে,
অসন্তোষ উপজয়,
হাত যোরে বোলো শুদ্ধ বাক,
পুস্তক বিচারি যেবে
তৈত কথা নাপাবাহা,
তেন্তে সবে নিন্দিবা আমাক ।। (৩৭১১)

এই উক্তি তৎকালীন সমাজে বিদ্যা শিক্ষার ব্যাপকতা ও বিদ্বান ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধার কথা প্রমাণ করে। দশরথের রাজসভার বর্ণনা প্রসঙ্গে —

"সেনাপতি যূথপতি, মন্ত্রী সন্ধিকৈ।"

ইত্যাদি বর্ণনা থেকে পৃষ্ঠপোষক রাজার রাজসভার ছবি-ও ধরা পড়ে। এখানে **'সন্ধিকৈ'** শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়। 'সন্ধিকৈ' আহোম রাজার পরিষদ শ্রেণীর একজন। এই শব্দের ব্যবহারে পৃষ্ঠপোষক রাজার সঙ্গে আহোম রাজার সম্পর্কের কথা অনুমান করা যায়।

বাল্মীকির রামায়ণে রাজা দশরথ রামকে যুবরাজ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। পক্ষান্তরে কন্দলীর রামায়ণে অযোধ্যাবাসী রামকে যুবরাজ করার অনুরোধ জানিয়ে বশিষ্ঠ ও অন্যান্য মন্ত্রী ও পুরোহিতদের রাজা দশরথের কাছে পাঠিয়েছেন, এই জনপ্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন —

১. প্রজা সবে বলয় হরিষ করে মন।
রাম যুবরাজ ভৈলে সফল জীবন ॥

২. দেব্র আগত আমি নোবোলোহো মিছা।
রাম যুবরাজ হৈবে সমস্তরে ইচ্ছা ॥ (১৫১১-১৫২৮)

এতে সভাসদ ও প্রজাদের সম্মানের আর একটি মাত্রা যুক্ত হয়েছে। যুবরাজের অভিষেকের সঙ্গে সঙ্গে কন্দলীর দশরথ রামকে রাজসভায় এনে বসিয়ে রাজার গুণ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান দান করেন। রাম দেশ এবং প্রজা সুপালনের আশ্বাস দান করেন। এই পর্বের এখানেই শেষ নয়, রাম সীতাকে যুবরাণীর কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত করেছেন যাতে পাত্রমিত্রাদির কাছে রাম লজ্জিত না হন। কন্দলীর এই সমাজ চিত্র এই বোঝায় যে তৎকালীন রাজার কাছে জনসাধারণ এবং পাত্রমিত্রাদি যথেষ্ট সম্মানিত ছিলেন যাদের সম্মুখে প্রয়োজনে অন্তঃপুরের স্ত্রীদেরও অবাধ যাতায়াত ছিল।

পান তাম্বুল এখনও আসামের সমাজে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। সভা, সমিতি, পূজা, পার্বণ, শ্রাদ্ধ বা বিবাহ সমস্ত কিছুতেই প্রথম এই তাম্বুলপান। তার বর্ণনাও রামায়ণে পাওয়া যায়। অর্থাৎ এ রীতি বহু যুগ চর্চিত রীতি।

রাম বনে গমনকালে গুহকের রাজ্যে উপস্থিত হলে গুহক প্রথমে রামকে কর্পূর তাম্বুল দিয়েই আপ্যায়ণ করেন।

কর্পূর তাম্বুল যত বিবিধ ভক্ষণ।
রামর আগত করিলেক উপসন ॥ (২০২০)

রামকে বনবাস থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য যখন ভরত বনযাত্রা করেন, তখন প্রজাদের মধ্যে সাজ সাজ রব পরে যায় সঙ্গে যাওয়ার জন্য। তার বর্ণনায় কন্দলী বলেছেন স্ত্রী স্বামীকে পান তাম্বুল দিয়ে উৎসাহিত করছে বনে যাবার জন্য।

বিলম্ব নকরা হেরা দেউ ধরা
কর্পূর তাম্বুল খাহা। (২০৮৩)

শুধু মুখ রঞ্জক তাম্বুলই নয় তৎকালীন বেশভূষার কিছুটা আভাস কন্দলী তাঁর রামায়ণে রেখেছেন।

অযোধ্যা কাণ্ডে কৈকেয়ীর আদেশে সীতাকে বল্কল পরিধানে বিরত রেখে দশরথের আদেশে বিভিন্ন বস্ত্র অলঙ্কারে সজ্জিত করা হয়। এখানে বিভিন্ন অলঙ্কারের নাম পাওয়া যায় —

১. শাশু পঞ্চাশতে পিন্ধাইলা অলঙ্কার।
মুকুট কুণ্ডল গ্রীবে সাতেসরি হার ॥
নেপুর পগরি আনো অলঙ্কার যত।
থানে থানে প্রতি প্রতি পিন্ধাইলা সমস্ত ॥
কঙ্কন কুণ্ডল রত্নাঙ্গুলি আরো কাঞ্চি।
সমস্ত শরীর অলঙ্কারে নিলা ধাঞ্চি ॥ (১১৩৭-৩৮)

রমণীর বস্ত্র অলঙ্কারের প্রাচুর্যের কথা বোঝা যায় সীতা বনবাস গমন কালে 'পেটারি' বা পেটিকার উল্লেখে —

চৈধ্য বরিষক লাগিয়া সীতার
বস্ত্র অলঙ্কার লৈয়া।
পেটারিত ভরি লৈয়া ঘান্ট করি,
সুমন্ত্র চড়িল গিয়া। (১১৫৭)

তাছাড়াও নেতবস্ত্র, নেতকমনি, পটবস্ত্র, চেলি ইত্যাদির উল্লেখ আছে। যুদ্ধে কবচ বা সন্নাহ পরিধানের কথা থাকলেও কোন সেলাই করা পরিধেয় সম্বন্ধে উল্লেখ নেই। রমণীগণের স্তন আবরণের উল্লেখও রামায়ণে পাওয়া যায়। উপরি উক্ত শ্লোকে বিভিন্ন অলঙ্কারের বর্ণনা আছে আর সুগন্ধির প্রয়োজনে ধূপ, পুষ্পমালা ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। লঙ্কাকান্ডে পুরুষের 'পাগ' বা পাগরির উল্লেখ দেখা যায়। প্রসাধনে চন্দনের কথাও পাওয়া যায় –

১. রাঘবর শোকে তুমি গৈলা যমপুর।
খন্ডাইলাহা অলঙ্কার শিথর সিন্দুর॥ (২২০১)

২. অনসূয়া বোলে যত দিলে অলঙ্কার।
সিন্দুর চন্দন তোর নুছোক আর॥ (২৬৪৬)

সধবার অলঙ্কার আর সিন্দুর এই দুইতেই অধিকার ছিল। উল্লেখযোগ্য যে নারীজীবনে বৈধব্য সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক ঘটনা। রামচন্দ্রের মায়া-মুন্ড দর্শনে বা নাগপাশে বন্ধনের সময় - সীতা বলেছিলেন – পুরুজনের উক্তি ছিল – 'অলক্ষণী সীতা নোহে বিধবার যোগ' (৪১৩১) আর্যসমাজে বিধবাবিবাহের কোন কথা বাল্মীকি বা কন্দলী দেন নি। তারাকে যে সুগ্রীব বিবাহ করেছিলেন তা বোধ হয় বানর অর্থাৎ কোন উপজাতি সমাজের সামাজিক নীতিসম্মত। তাহলেও সধবার গৌরব সর্বত্র বন্দিত।

মাধব কন্দলীর রামায়ণে খাদ্যের পরিচয়ও কিছু পাওয়া যায়। সে সময়েও এ অঞ্চলের প্রধান খাদ্য ভাত ছিল, এর প্রমাণ পাওয়া যায় অযোধ্যা কান্ডে দশরথের উক্তিতে। রামকে বনে যাবার প্রাক্‌কালে একদিন ভাত খেয়ে যেতে অনুরোধ করেছিলেন তিনি।

পরিছেদা একে থানে ভুঞ্জো
আজি ভাত। (অ.কা. ১১১১)

রামের অস্বীকৃতি ও প্রত্যুত্তরটি উল্লেখযোগ্য –

রাঘবে বোলন্ত বাপ আপনে।
আজি দুয়ো ভাত খাইবো কালি সাইবধানে। (১১১২)

এই উক্তিতে পুত্র বিচ্ছেদ কাতর পিতার হৃদয়বেদনা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে খাদ্যের পরিচিতিও প্রকাশিত হয়েছে । এ ছাড়া ফল, মূল, মাংস ইত্যাদি খাদ্যের উল্লেখ বারে বারে পাওয়া যায় । ফলের বর্ণনায় আসামে পাওয়া ফলেরই নাম উল্লেখযোগ্য । নারঙ্গ (কমলা), বদরি (টককুল) খাজুরি, তেঁতেলী, কঠাল, আম, জাম, নারিকল, আমলকি, শিলিখা (হরিতকি), কর্দৈ (কামরাঙ্গা), আমড়া ইত্যাদি । কুম্ভকর্ণকে জাগানোর প্রসঙ্গে লঙ্কাকাণ্ডে বিশাল ভোজ্য বস্তুর তালিকা পাওয়া যায় ।

ডেকা পর্ব্বতর সমান বাঢ়িল,
অন্ন ব্যঞ্জনর মিঠা ।
মেরুর সমান ছবার করিল
খবিকা জহাব পিঠা ।। (৫৪২২)

এই 'পিঠা' আসামের স্নেহের দান ; 'পিঠা' ছাড়া কোন উৎসবই সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে না ।

মাধব কন্দলীর রামায়ণে তৎকালীন আসামের বাসস্থানের একটি চিত্র পাওয়া যায় রামের প্রাসাদ বর্ণনায় । বাল্মীকি রামের প্রাসাদের যে বর্ণনা দিয়েছেন তার সঙ্গে কন্দলীর বর্ণনার কোন মিল পাওয়া যায় না । তিনি আসামের বাঁশ, খড়, বেত দিয়ে তৈরী বাড়ীর বর্ণনাই করেছেন — কেবল মাত্র তার স্থান সোনা, রূপো, প্রবাল ইত্যাদি নানা মূল্যবান ধাতু । কেননা, মাস্তুলী, রূরুলী, সূচি কামী মাত্র বাঁশ, বেতের ঘর তৈরী করতেই ব্যবহার হয় । তবে তাঁর বর্ণনায় প্রাসাদের দেওয়াল অলঙ্করণের কথা পাওয়া যায় । যা থেকে অনুমান হয় যে সে সময়ে যে কোন বাড়ীর দেওয়ালের শোভা বর্ধনার্থে চিত্র আঁকা হত । এক্ষেত্রে একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে মধ্যযুগে আসামের দেবালয় ছাড়া রাজার বাসস্থান আর অন্যান্য ঘর বাড়ী সবই বাঁশ, খড় ইত্যাদির দ্বারাই তৈরী হত । আহোম রাজত্বের শেষ ভাগে বাঙ্গার স্থপতিদের এনে আহোম রাজারা প্রাসাদ, এম্ফিথিয়েটার (রঙ্ঘর), গুপ্ত মহল, (তলাতল ঘর) ইত্যাদি তৈরী করিয়েছিলেন ।

প্রাকৃতিক পরিবেশ নদী পর্বত ও বন-প্রান্তর পশুপাখী, ধাতুপর্যায়ের নানা বর্ণনা দিয়েছেন কন্দলী নানাস্থানে । বনগমনের পূর্বে রাম সীতাকে যে বনের বর্ণনা

দিয়েছেন তা এই রকম –

মহিষ বরাহ বাঘ সরভ গবয় ।
সিংহ ঘোড় রায়ে অস্তি ত্রাসক জনয় ।।
গোলাসতে রাজগোম পর্ব্বতীয়া বোর ।
মান্ডলীক অজগর যাক নাহি খোর ।।
ইসবক আদি করি ভয়ঙ্কর সর্প ।
দরশন মাত্রে কত্তে হরে বল দর্প ।।
কীট পতঙ্গ জোক নকুল ইন্দুর ।
ইটো সব জন্তু আছে বনত প্রচুর ।।
গুন্ডকুরি পরুরা আছয় অসিখোন ।
যাহার প্রহারে সিংহে নসহয় টান ।।
বিহঙ্গম চাতক বনত সব মিলে । (১৮৫৫-৫৬)

এই অরণ্যের কল্পনা অন্য কোন রামায়ণী কবির পক্ষেই অসম্ভব । গঙ্গার বর্ণনায় ও মুখ্যত: লৌহিত্যের ছবিই ফুটে ওঠে –

কুম্ভীর কচ্ছপ মৎস শুশু ঘড়িয়াল ।
নানাবিধ জলজন্তু করয় আস্ফাল ।।
হংস সারসর মধ্যে বক চক্রবাক ।
জলচর পক্ষীগণ নখি ডাকে জাক ।। (২০১৭-১৮)

একটি উল্লেখনীয় বিষয় এই যে শুশু শিশুমার বা মিষ্টিজলের ডলফিন গঙ্গা আর ব্রহ্মপুত্রেই আছে । তাছাড়া উপমান রূপে চিত্রকল্পে নদীর বহুল প্রয়োগ কেবল নদীবহুল দেশের কবির পক্ষেই স্বাভাবিক ।

অযোধ্যা নদীত ভৈলা দশরথ জল ।
কৈকেয়ী রবিজালে শুমিন সকল ।।
প্রজামৎস কচ্ছপ তরত পরি মরে ।
রাম শোক মৎস্যরঙ্গে খেদি খেদি ধরে ।। (২৬০০-৬১)

আবার ভরত শত্রুঘ্ন রামের অন্বেষণে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হলে গুহক যে নৌবাহিনী নিয়ে তাদের সেবায় অগ্রসর হন তার বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায় যে মাধব কন্দলী-র নৌবাহিনী সম্পর্কেও অনুভব ছিল। আর তা সম্ভবত: তৎকালীন রাজাদের ব্রহ্মপুত্রে রক্ষিত নৌবাহিনীর সুস্পষ্ট ধারণা থেকেই হয়েছিল।

পশ্চিমে তিরিশে চল্লিশে সে হাতী চড়ে।
তথাপিতো নাব সব খানিকো নলরে।।
পর্বত সমান নাবুসব বাহি যায়।
ছাপে ছাপে নাও যেন পবন উরায়।। (২৪৫৬)

চিত্রকূট পর্বতে উপস্থিত সীতা এবং রাম যে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখেছেন সেই ফুল ফলের বর্ণনায় বাল্মীকির উক্ত নিসর্গ এবং আসামের প্রকৃতি মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

১. জাই যুতি বকুল বন্দুলি কর্ণিকার।
কাঞ্চন টগর কুন্দ সেরালী মন্দার।।
অশোক পলাশ ফুলি গৈল হিসা হিসি।
নাগেশ্বর চম্পক ফুলিল অহর্নিশি।।
পাণ্ডীত গরবক ফুলিল সেবৃতি।
ধুন্দুর কনৌর থাকো ফুলিল মালতী।।
ওর পুষ্প মালি দুরামালি আবু মালি।
তমাল তুলসী মাধে মরুয়া সেরালী।। (২০৭০-৭৪)

২. দেখ দেখ সীতা আম জাম পনিয়াল।
আম্বুল কন্ঠাল নারিকল নানা ফল।।
কমলা মোহরি গ্রীফলর গন্ধ বহে।
নানা ফুল ফলর সুরভি বায়ু বহে।। (২০৭৯)

৩. কঙ্ক বঙ্ক মউপিয়া পক্ষী মনোনীত।
নানাবিধ চিত্র পক্ষী দেখিতে শোভিত।।
কোকিলব বার পেচা ফিঙ্গা শুকসারি।
মনোহর পক্ষী যত বর্ণাইতে ন পারি।। (২০৮১)

৪. কুমুদ প্রকাশে চম্পা সরোবর পাশ ॥
জলপদ্ম স্থলপদ্ম দেখি আতিকার ।
সেরালী নেরালী পুষ্প দেখিলা অপার ॥
মধুপায়ী চটক থাকয় ভবি পুরি ।
শরদতে মধু পান করে ফুরি ফুরি ॥ (৩৩৮২)

লঙ্কাতে হনুমান যে পক্ষী পুষ্প দেখেছিলেন তা সবই সোনা দিয়ে তৈরী —

সুবর্ণর হংস লড় আলিচক্রবাক্ ।
সুবর্ণর সবালি উদয় ডাকে ডাক ॥
সুবর্ণর ময়না ভাটৌ চুটিয়া শালিক ।
সুবর্ণর কপবতি ফিঙ্গা পুণ্ডরীক ॥ (৪০১১)

এই বর্ণনা আর আসামের বসন্তকালীন প্রকৃতির বর্ণনায় কোন ভেদ নাই ।

বাল্মীকি ও মাধব কন্দলী

রামায়ণের প্রাদেশিক ভাষায় অনুবাদসমূহের মধ্যে মাধব কন্দলীর অনুবাদ বোধহয় সর্বাপেক্ষা সমধিক মূলানুগত । কিষ্কিন্ধ্যা কান্ড শেষে কন্দলী লিখেছেন —

বাল্মীকি রচিলা শাস্ত্র পদ্য পদ্য ছন্দে ।
তাহাক বিচার আমি করিয়া প্রবন্ধে ॥
আপোনার বুদ্ধি অর্থ যিমত বুজিলো ।
সংক্ষেপ করিয়া তাক পদ বিরচিলো ॥
সমস্ত রসক কোনে জানিবাক পারে ।
পক্ষী সব উড়য় যেন পথা অনুসারে ॥
কবিসব নিবন্ধয় লোক ব্যবহারে ।
কতো নিজ কত কতো লম্ভা কথা অনুসারে ।
দেববাণী নুহি ইটো লৌকিক হে কথা ।
এতেকে ইহার দোষ ন লৈবা সর্বথা ॥ (৬১১০-১৬)

আবার লঙ্কাকাণ্ড শেষে বলেছেন –

সাতকাণ্ড রামায়ণ   পদবন্ধে নিবন্ধিলো
লম্ভা পরিহরি সারোদ্ধৃত ।
মহামাণিক্যর বোলে   কাব্যরস কিছু দিলো
দুগ্ধকে মথিলে যেন ঘৃত ॥   (৬৭১০)

এই উক্তি দুটি পূর্বে নানা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে । রামায়ণের সারসংক্ষেপ লম্ভা অর্থাৎ অতিরঞ্জন বাদ দিয়ে কবি বুদ্ধিমত রচনা করেছেন । কিন্তু কবি কি লম্ভা বা খানিকটা অতিরঞ্জন বা কাব্যরস একেবারে বাদ দিতে পারেন ? কথা প্রসঙ্গে কিছু লোককথা আপনি এসে পড়ে রসসৃষ্টির জন্য । অধিকন্তু পৃষ্ঠপোষক মহামাণিক্যের কথায় – তিনি লৌকিক কথার সন্নিবেশ করেছেন স্থানে স্থানে । সংক্ষেপ করতে গিয়ে কোন অংশ বাদ দিতে হয়েছে আবার রস সৃষ্টির জন্য কোন বিষয় বা বর্ণনা লোককথা থেকে সংযোজন করতে হয়েছে । কেবল এইসব স্থলে বাল্মীকির রচনা থেকে খানিকটা আলাদা করা হয়েছে ।

কাহিনী বিশ্লেষণ ও চরিত্র বিচার প্রসঙ্গে বর্জন সংযোজন, সংক্ষেপণ সম্বন্ধে পূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে । কাজেই এখানে বিচার বিশ্লেষণের মধ্যে না গিয়ে কেবল বিষয়গুলির উল্লেখমাত্র করা গেল ।

১. বিভিন্ন কাণ্ডে কাহিনী বিন্যাসে কিছুটা পার্থক্য আছে যেমন বাল্মীকি অযোধ্যাকাণ্ড শেষ করেছেন অত্রি অনসূয়ার সহিত সীতা ও রামচন্দ্রের সাক্ষাতে । কিন্তু কন্দলী এ আখ্যান দিয়ে সুরু করেছেন অরণ্য কাণ্ড । বাল্মীকির অরণ্যকাণ্ডের শেষ শবরীর উপাখ্যানে এবং *পম্পা* সরোবর বর্ণনা দিয়ে সুরু কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড । কন্দলী চম্পা (পম্পা) বর্ণনা দিয়ে অরণ্যকাণ্ড শেষ, সুগ্রীব মিলন দিয়ে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড সুরু । সম্পাতির কাহিনী ও বানরগণের সমুদ্র লঙ্ঘনের মন্ত্রণা দিয়ে বাল্মীকির কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ড শেষ ও হনুমানের সাগর লঙ্ঘন দিয়ে সুন্দরাকাণ্ডের সুরু । কন্দলী বানরগণের মন্ত্রণা দিয়েই সুরু করেছেন সুন্দরাকাণ্ড, শেষ করেছেন বিভীষণের সঙ্গে রামচন্দ্রের মিত্রতাবন্ধনে । এই কাহিনী বাল্মীকি লঙ্কাকাণ্ডের অন্তর্গত বিবরণে নয়, বিন্যাসের পার্থক্য ।

২. অযোধ্যাকান্ডে রামকে যুবরাজ পদে অভিষেকের প্রস্তাব বাল্মীকিতে দিয়েছিলেন দশরথ নিজেই — অনুমোদন করে প্রজামন্ডলী । কন্দলীতে বিপরীত প্রজামন্ডলী প্রস্তাব করে রামকে যুবরাজ করতে ।

৩. বাল্মীকির রচনা বহির্ভূত কন্দলীর নিজস্ব সংযোজন এইগুলি —
(ক) রামের কুশপাদুকা (কুশর খরম দুটি আছে তাক দিল — অ. ২৫৮১) (খ) সীতার জন্ম বিবরণে মেনকার উল্লেখ (নামত মেনকা গৃহে দেব অপেস্বরী — অরণ্য ২৬৫০), (গ) তারার অভিশাপ - (কিষ্কিন্ধ্যা ৩৬৬৬-৬৭), (ঘ) রাবণদ্বারা বিভীষণের পদপ্রহার (বিভীষণ বীরর যে হৃদয় মাজত গৈয়া ক্রোধে মারিলেক এক লাথি — সুন্দরা-৪৭৬৭), (ঙ) রামের শরণ নেবার আগে মাতা ও কুবেরের সঙ্গে সাক্ষাৎ (প্রণাম করিল গৈয়া মায়র চরণে - ৪৭৭৪ এবং কুবের দদাত সোধো - ৪৪৭৭-৪৭৮৬), (চ) হনুমানের বিশল্যকরণী আনয়ন পথে গন্ধকালী ও কালনেমীর বৃত্তান্ত (লঙ্কা ৬১১০-৬২১০)
(ছ) সরমার চিলিনী রূপ ধারণের কথা (অন্তরীক্ষে চলিলা চিলনী রূপ ধরি (লঙ্কা ৪১৫১), (জ) ব্রহ্মার আদেশে ইন্দ্র কর্তৃক অশোক বনে সীতাকে পায়েস দান (লঙ্কা ১২১০-১৩০০)

৪. বাল্মীকি রচনার কোন কোন অংশ বাদও দিয়েছেন কন্দলী - যেমন (ক) সুন্দরাকান্ডে তৃতীয় সর্গে বর্ণিত লঙ্কাধিষ্ঠাত্রী চন্ডিকার সঙ্গে হনুমানের সাক্ষাৎ, (খ) অরণ্যকান্ডে ৭১তম অধ্যায়ে অয়োমুখী বৃত্তান্ত ।

৫. কিছু কিছু স্থানে ঘটনায় ব্যক্তিনামের রূপান্তর ঘটেছে —
(ক) সুন্দরকান্ডে অশোককাননে সীতাকে বধ করতে উদ্যত রাবণকে বাধা দিয়েছিলেন রাবণের পত্নী ধান্যমালিনী, কিন্তু কন্দলী বলেছেন — মন্দোদরী (মন্দোদরী বোলয় - ৪২১৩) ।
(খ) ইন্দ্রজিত বধের পর রাবণ আর একবার সীতাবধে উদ্যত হলে, বাধা দিয়েছিলেন মন্ত্রী সুপার্শ্ব । কন্দলী বলেছেন মন্ত্রী অরবিন্দ (অরবিন্দ মন্ত্রী যে জানন্ত অভিপ্রায় - লঙ্কা ৬৩২৬)

এই জাতীয় ছোটখাট নানা বিষয়ের অনৈক্য আছে কিছু কিছু । চরিত্র-গুলির আদর্শ ঠিক আছে যেখানে কিছু অসাদৃশ্য বা আতিশয্য আছে তা চরিত্র বিশ্লেষণ কালে উক্ত হয়েছে ।

কন্দলীর কাব্যসৌন্দর্য :

কাব্যসৌন্দর্য বিচারে বহিরঙ্গভাবে শব্দ প্রয়োগ, ছন্দ, অলংকার, বিশিষ্ট চিত্রকল্প রচনা, বাগবিধি, প্রবাদ বা সুভাষিত বাক্যাবলী ইত্যাদির কথা এবং অন্তরঙ্গ ভাবে মুখ্যত রমণীয়তা ও রসের বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে । এই উভয় দিক থেকেই মাধব কন্দলীর স্থান সমুচ্চ ।

শব্দচয়ন ও প্রয়োগে কন্দলী তৎসম, অসমীয় তদ্ভব, অর্ধ তদ্ভব ও দেশীয় শব্দের মিলন ঘটিয়ে এমন সরল সমন্বিত ভাবে প্রকাশ করেছেন - যা তাঁর অসাধারণ কবিপ্রতিভার পরিচায়ক । শব্দ নির্বাচন ও যথাযোগ্য স্থলে সমন্বিত করে তার যোজনা কবিত্ব শক্তির বিরল উদাহরণ । এক একটি শব্দের মধ্যে যে ধ্বনি থাকে – তা দিয়ে ঘটনার বা চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায় । একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় । কৈকেয়ীর কুমন্ত্রণায় রামের বনবাস ঘটেছে, অযোধ্যার চরম দুর্গতি ও দশরথের মৃত্যু ঘটেছে । এই সমস্ত দুষ্কর্ম ও অপরাধের আধার কৈকেয়ীর পরিচয়টি – ভরতের ভর্ৎসনার মধ্যে প্রতিটি শব্দে আলাদা ব্যঞ্জনায় ধ্বনিত –

শুষিণী নাশিনী দ্বিকারুণী সংহারিণী ।
নির্দয়িণী, রাক্ষসিনী বাঘিনী দারুণী ।।
যক্ষিণী, ডাহিনী তই স্বস্বামী ভক্ষিণী ।
পিশাচিনী, আরে রাক্ষী ভৈলি অলক্ষিণী ।।
সকলো লোকক শোকে মরি নিবিছুই ।
অযোধ্যা রাজ্যত তই ভৈলি [illegible] ।।
বাপক মারিলি আগে আরে মোক খাহা ।
নিলাজী বেবিনাচারী মরিবাক যাহা ।।   (২২৭৭ - ৭৯)

পদ, দুলড়ী, ছবি ও ঝুমুরী – এই চারটি ছন্দে মাধব কন্দলী রচনা করেছেন । যেখানে বর্ণনায় বেগ মন্থর সেখানে দুলড়ি (বাংলার ত্রিপদী) এবং মন্থরতা সুরেলা হলে ছবির (বাংলার দীর্ঘ ত্রিপদী) প্রয়োগ । আর আবেগঘন দ্রুততার সময় ঝুমুড়ি । আর সাধারণ বর্ণনা পদ (বাংলা পয়ার) । সাধারণভাবে দুলড়ি – ৬+৬+৮ । ছবি - ৮+৮+১০, ঝুমুরী - প্রতি চরণে ৮ আর পদ ১৪ । মোটামুটি হিসাবে দেখা যায় যে মাধব কন্দলী পাঁচটি কান্ডে দুলড়ি (১২৮+৪২+৪২+৬০+২৭৬) = ৫৪৮ টি, ছবি (১৪+৩৮+৩৭+১০৫) = ১৯৪ টি, ঝুমুরী (০+২৬+১৫+৩+ ০) = ৪৪টি, আর পদ (৯৯৭+ ৬৯১+৫০৭+২৫৩+১৪৮৮) = ৩৯৯৬ ব্যবহার করেছেন । উল্লেখযোগ্য যে মাধবদেব এবং শংকরদেবও আদি ও উত্তর কান্ডে এই আদলেই ছন্দের ব্যবহার করেছেন ।

কন্দলী শব্দালংকার ও অর্থালংকার উভয় প্রয়োগেই সিদ্ধ হস্ত । অর্থলংকা-রের মধ্যে উপমাশ্রেণীর অলংকারই প্রধান । কন্দলীও এই জাতীয় অলঙ্কার-ই ব্যবহার করেছেন । অলংকৃত বাক্যপ্রয়োগে তাঁর চিত্রকল্পগুলিও মনোরম, কিছু চিরাগত কাব্যিক আর কিছু অভিজ্ঞতা লব্ধ উপমান দিয়ে রচিত । উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, দৃষ্টান্ত প্রমুখ সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কার স্বভাবতঃই সমধিক –

ক) সীতার প্রভাবে মুখ মলিন সবার ।
পূর্ণচন্দ্র উদয়ে ন জ্বলে যেন তার ॥ (১৫১৫)

খ) দশরথ সাগর তরঙ্গী নদী তই ।
অনপেক্ষে সুখার মাইবি জানেলোহো মই ॥
প্রিয় গঙ্গা কৌশল্যা গম্ভীর বেগে বহে ।
রাম অভিষেকক বেকত করি কহে ॥ (১৫৮০)

গ) শোকবহ্নি শ্বাস ধূম বিয়োগ তোমার ।
নিরন্তর শবদাহ করিবে আমার ॥ (১৭৯৭)

ঘ) কৈকেয়ীক দেখিয়া শরীর মোর কাম্পে ।
হরিণীক দিতে যেন বাঘিনীয়ে জাম্পে ॥
সৰ্পিণীর আগত যেন মণ্ডুকীর গতি ।
শেণীর আগত যেন কাম্প কপোবতী ॥ (১৭১১)

ঙ) মুখচন্দ্র অরি অমৃতর অভিলাষে ।
গ্রাসিবাক লাগি রাহু আসি ভৈলা পাশে ॥
ভ্রূযুগ ধনুত কটাক্ষ যেন শর ।
চমকিয়া রাহু গৈল গগন উপর ॥ (১৮২৯)

চ) উজানি বাহন্তে মই বাহিলোহো ভাটি ।
লাভক চাহন্তে মূলক করিলোহো নাঠি ॥
লঙ্কাক দহন্তে মই একো ন চাহিলো ।
নগরর লগে সীতা দেবীকো দহিল ॥ (৪৫৩৭)

প্রতি সাহিত্যেই প্রবাদ, প্রবচন, সূক্তি, সুভাষিত - অমূল্য সম্পদ । প্রভূত অভিজ্ঞতা গভীর উপলব্ধি এবং অসাধারণ কবিত্ব শক্তি না থাকলে সূক্তি, প্রবাদ প্রবচনের সৃজন হয় না । মাধব কন্দলীর প্রবাদ প্রবচন অসমিয়া সাহিত্যে, সমাজে জীবনে এক অমূল্য সম্পদ । অপর্যাপ্ত প্রবাদ প্রবচনের কয়েকটি দেওয়া যাক্ –

১. সাপে খায়া মারোক গরল নোহে খাহা ।
স্থালে হান্দি বান্ধি নোহে মরিবাক যাহা ॥ (১৫৭০)

২. অঙ্গারক দুগ্ধে করে শতেক প্রক্ষাল ।
তথাপিতো নেরয় স্বভাব্ বর্ণ কাল ॥ (১৫৮১)

৩. বৃদ্ধর তরুণী ভার্য্যা আতি বর রতি ।
তোর বোল বাধিবাক নুহিবে শকতি ॥ (১৬০০)

৪. সুখ দুখ দুই ভুঞ্জিলেহে যায় ক্ষয় ।
তুলা ধরিয়াছে বিধি ভাগ্যে সে মিলয় ॥ (১৭৫৩)

৫. যেহেন সাপর বিষ শিখাগ্রক গৈল ।
নমাই হানি পারুড়া নিষ্প্রভ করি থৈল ॥ (১৭৬৫)

৬. আন্ধলীর লাঠি কহি লাগি যায় । (১৭৭৭)

৭. প্রবলে সহিতে দ্বন্দ্ব নুহিতে উচিত । (১৭৯১)

৮. আমি ভৈলো কৈকেয়ীর অষ্টমীর ছাগ । (২১০৬)

৯. নিশ্বাস ফোকারে যেন ঠঙ্কারির ভাটি । (২১০০)

১০. মরন্তাক মারিলে নাহিকে কিছু ফল । (২১৩৭)

১১. আমার বাপর শাপ প্রচণ্ড অগনি ।
শুকান বনক যেন দহিবেক ছনি ॥ (২১৫৯)

১২. চণ্ডবায়ে কাম্পে যেন কদলীর বন । (২১৯১)

১৩. বিনা মেঘে আসি নিঘাত পরিয়া
যেন ভূমি ভৈলা চূর ।

১৪. বোঝার উপর শাক যেন পটন্তর ।

১৫. তপত খোলাত করে মাছ যেনমত । (২৩১৫)

১৬. বৎসক নাপায়ো যেন ধেনু হামলায়ে । (২৪২৯)

১৭. যেন কাক জীবয় বলির ভাত খাই । (২৫৫৭)

১৮. শুকান অরণ্য প্রজা লাগি গৈল ছন্নি । (২৫৯৮)

১৯. কোপ করি ছাগে পর কটার ঘষয় । (২৮৩৮)

২০. ঘৃত পাই যেহেন অগ্নি জ্বলি গৈল । (৩০০৮)

২১. ধীরে ধীরে যায় ভরি নবাঢ়য় ত্যাগ ।
কাটিবাক নেই যেন অষ্টমীর ছাগ ।। (৩০৭২)

২২. সার প্ুটি বাঘ তোর হরিণর মুখ ।।
মুখত অমৃত তোত চিত্ত বিষঘট । (৩১০৮)

২৩. হেনয় স্বভাব নিদারুণ স্ত্রীজাতি ।
ভাই ভাই বেলগায়ে মাজে দিয়া কাটি ।। (৩১১৪)

২৪. হাড়ী জাতি হুয়া পরিবাক চাস বেদ । (৩১৭৬)

২৫. বটালী নকাটে যেন বিনা হাঠুরিয়ে । (৩৭১৩)

২৬. ধান্যক পীড়িয়া বিনাই বনে থাকে ভুম্বি । (৩৭১৫)

২৭. ভৃত্য হুয়া ছেল কুঢ় বোলয়স
গৃহস্থর গায়ে থসু । (৩৭৩৩)

২৮. বিড়ালীর যদি দোষক ধরিয়া
নিতেহি হান্ডি পেলাইবা । (৩৭৪১)

২৯. বিপ্রর কপিলা যেন চন্ডালের ঠায়ে ।। (৪১২০)

৩০. উঝরা ভিঠিত যেন থাকি শৈল স্তম্ভ ।। (৪১৪০)

৩১. বায়ু পায়া কদলী কাম্পয় যেন মতে । (৪১৬৬)

৩২. তুলা নিবে নোরারয় ভার বান্ধে গিলে ।
শুশুকুরি পুরুয়ায়ে হাতী গোট গিলে ।।
ঢোল হেন ডিমা পারে চুঙ্গার বাদুলী ।
পিপিয়া চটকে পর্ব্বতক নয়ে তুলি ।। (৪২১২)

৩৩. কুমারর চাক যেন ফুরাইলন্ত ধম্বি । (৪৩৬০)

৩৪. কাকো তুলি আছারন্ত বস্ত্র যেন ধোরে । (৪৩৬৯)

৩৫. ডালত ধরিয়া কতো ওলমা বাদুলী । (৪৫৩৯)

৩৬. তপত খোলাত দিলে যেন মৎস্য মরে ।। (৪৬৩৮)

৩৭. শুকান তৃণত যেন অগিনি লাগিয়া গেল । (৪৭৪২)

৩৮. আসন্ন কালত পন্ডিতর বুদ্ধি নাশ ।। (৪৯১০)

৩৯. খর লাগা ধান যেন বরিষণ জলে । (৪৯৩০)

৪০. আগ তল যায় যদি হাতীও বুরয় । (৪৯৪৬)

৪১. অলপ পানীর মল দদরা দদরি । (৪৯৩০)

৪২. মুখে ধান দিলে আখৈ হ'য়ে যেন । (৫১৮৩)

৪৩. তেলীয়ার জান্ত যেন চোবায়ন্ত দান্ত । (৫০২০)

৪৪. দান্ত ভাঙ্গা সাপ যেন মিছাত ফোম্মাহা । (৫৪৫৩)

৪৫. অগনি দহন্ত যেন শুকান বনক । (৫৪৮৬)

৪৬. নুষুত্তয় কুকুরায় নাদয় বিস্তর । (৫৭৭২)

৪৭. বাঁচি ধান বুইলো যেন উখরা ভূমিত । (৫৮১৯)

৪৮. অগনি উপজি যেন কাষ্ঠক দহয় । (৫৮৭০)

৪৯. কুশর কন্টক দিতে ঠাই নাই গাত্রর । (৫৯৫৫)

৫০. কুহুরি ঢাকিল যেন পৌষ যে মাসর । (৬০৯৫)